কড়াপুর মিয়া বাড়ি মসজিদ। বরিশাল সদরের কড়াপুরে অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ। দোতলা এই মসজিদের নিচে ছয়টি দরজা, দোতলায় তিনটি দরজা, তিনটি গম্বুজ, ৮টি বড় ও ১২টি ছোট মিনার রয়েছে। এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা হায়াত মাহমুদ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে প্রিন্স অফ ওয়েলস দ্বীপে নির্বাসিত হন এবং তাঁর বুজুর্গ উমেদপুরের জমিদারিও কেড়ে নেয়া হয়। দীর্ঘ ষোল বছর পর দেশে ফিরে তিনি দুটি দিঘি এবং দোতলা এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটির স্থাপত্যরীতিতে পুরান ঢাকায় অবস্থিত শায়েস্তা খান নির্মিত কারতলব খান মসজিদের অনুকরণ দৃশ্যমান। মনে করা হয়ে থাকে ১৮শ শতকে এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। মসজিদের সামনে রয়েছে বিশাল এক দিঘি।

গুঠিয়া মসজিদ। বরিশাল মহানগরী থেকে ২২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে বানারীপাড়া সড়কসংলগ্ন উজিরপুর উপজেলার গুঠিয়া গ্রামে এর অবস্থান। সম্পূর্ণ ব্যক্তি উদ্যোগে অনুপম শিল্পের ছোঁয়ায় তৈরি করা হয়েছে বায়তুল আমান জামে মসজিদ ও ঈদগাহ কমপ্লেক্স। স্থানীয় লোকদের কাছে এটি পরিচিত গুঠিয়া মসজিদ নামে। এস সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু তার নিজস্ব অর্থায়নে মসজিদটি নির্মাণ করেন। ১৪ একর জমির উপর নির্মিত মসজিদটির ডান পাশে রয়েছে একটি পুকুর, পুকুরটির চারপাশ নানান রঙের ফুল ও গাছ দিয়ে সাজানো হয়েছে। মসজিদটির তিন পাশে খনন করা হয়েছে কৃত্রিম খাল। মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের তিন-চারটি মসজিদের আদলে। মসজিদের সামনের পুকুরটি এমনভাবে খনন করা হয়েছে যাতে পানিতে মসজিদটির পুরো প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

নবীন

পঞ্চদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা এপ্রিল-জুন ২০১৭

সূ চি প ত্র

বৈশাখ ও পরিবর্তনময়তা ২
সবুজায়ন ও সামাজিক সচেতনতার অনন্য দৃষ্টান্ত ৪
লোকে যারে বড় বলে বড় সে হয় ৫
বিসিএস: লিখিত পরীক্ষার মহারণে (ধারাবাহিক) ৬
অংকুর ৮
নেট ইশকুলে যাই ৯
অঙ্গ প্রতিস্থাপন: বাংলাদেশও এগিয়ে যাচ্ছে ১১
মেধা লালন প্রকল্প কী এবং কেন? ১৪
লুমিনারির পথ চলা ১৫
কারা তরুণদের অনুপ্রেরণা ১৬
জীবনে যা সবারই শেখা উচিত ১৮
বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ, সঙ্গে ভাতা ও চাকরি ১৯
নির্ভুল জীবনবৃত্তান্ত লেখার ছয় পরামর্শ ২১
প্রকল্প সংবাদ/ফাউন্ডেশন সংবাদ ২২
অংকুর ২৬
স্মার্টফোনে আসক্তি কমাবেন কীভাবে ২৭
মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা
বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে ২৯
মাথায় কত প্রশ্ন আসে ৩১

সম্পাদক : তাসনিম হাসান হাই সহকারী সম্পাদক : মো. শাহরিয়ার পারভেজ

প্রকাশক : হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ৯-সি, রূপায়ন শেলফোর্ড, প্লট নং ২৩/৬, ব্লক-বি, বীর উত্তম এ এন এম নুরুজ্জামান সড়ক শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন : ৯১২১১৯০, ৯১২১১৯১, ০১৭২৭২০৯০৯৮

বৈশাখ ও পরিবর্তনময়তা

আধুনিক জীবনধারার মধ্যে বাঙালির বৈশাখ নিজ সত্তা সম্পর্কে সবাইকে সচকিত করতে পেরেছিল এবং বৈশাখি উৎসব প্রতীক হয়ে উঠল সব বাঙালির মিলনের; আত্মসত্তা ও আত্মপরিচয় ফিরে পাওয়ার স্ফূর্তি জোগাল বৈশাখ। বাঙালির সংস্কৃতি-সাধনা ও রাজনৈতিক সংগ্রাম এভাবেই পথ করে দিয়েছিল বাঙালির জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার, বহু ত্যাগ ও রক্তদানের মধ্য দিয়ে একাত্তরে ঘটেছিল যার অভ্যুদয়।

২০০৬ সালে সালজবুর্গ মিউজিক ফেস্টিভালের সূচনায় ভাষণ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল মার্কসবাদী সমাজতত্ত্ববিদ এরিক হবসবামকে। তাঁর বক্তৃতার শিরোনাম ছিল 'একবিংশ শতকে উৎসব আয়োজনের কোনো কারণ কি থাকতে পারে?' ইউরোপের এক প্রধান সংগীত উৎসবের উদ্বোধনী ক্ষণে এমন আলোচনা খুব বেমানান মনে হতে পারে, কিন্তু এরিক হবসবামের বক্তব্যের পাঠ নিলে সেই খটকা দূর হতে বিলম্ব হয় না। তিনি উৎসবকে বিচার করেছেন পরিবর্তনময়তার আলোকে, এর সঙ্গে অর্থনীতি ও সমাজের যোগ বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এবং উৎসবের প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার পথ খুঁজতে চেয়েছেন। তিনি দেখতে পেয়েছেন, ইউরোপে বড় আকারের সংগীত বা সাহিত্যিক বা নাটক বা চলচ্চিত্র উৎসব করপোরেট সহায়তানির্ভর হয়ে পড়ছে, বিনোদনের ইন্ডাস্ট্রি তার অংশ হয়ে পড়ছে উৎসব এবং কতক ক্ষেত্রে উৎসব হয়ে উঠছে কালচারাল ট্যুরিজমের অংশ। তবে সবকিছুর পরও তিনি দেখতে পেয়েছেন উৎসবের সার্থকতা।

এরিক হবসবাম ইউরোপের ইতিহাসের নিরিখে উৎসবের পরিবর্তনময়তা বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। ১৮১৫ সাল থেকে পরবর্তী ৫০ বছরে ইতালিতে ছয় শতাধিক নতুন নাট্যশালা নির্মাণের মধ্যে তিনি নতুন বুর্জোয়া শ্রেণির জাগরণের পরিচয় দেখতে পান, জন্মসূত্রে অভিজাতদের স্থান দখল করে নিচ্ছে শিক্ষা ও দক্ষতার গুণে গুণান্বিত এক শ্রেণি, সংখ্যায় যারা অনেক বড় এবং পুরনো সমাজের ভিত পাল্টে দিচ্ছিল তাদের নতুন সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি দ্বারা। এই সময়ে নির্মিত ইউরোপীয় অপেরা হাউসগুলো রাজভবন কিংবা ধনবানের প্রাসাদের অনুকরণে নির্মিত হলেও তার ভেতরে ছিল অতীতকে অস্বীকার করার প্রবণতা। এসব প্রতিষ্ঠান, হবসবামের মতে, ছিল

'পোটেনশিয়ালি সাবভার্সিভ'। আজকের উৎসবের মধ্যে নতুন কী উপাদান রয়েছে, সেটা শনাক্ত করতে চেয়েছেন হবসবাম। তাঁর মনে হয়েছে, সালজবুর্গ মিউজিক ফেস্টিভালের মতো চিরায়ত ধারা যেমন সংরক্ষণ করতে হবে, তেমনি নতুনকেও জানতে হবে। পাশ্চাত্যের পটভূমিকায় তাঁর এসব পর্যালোচনা আমাদের বাস্তবতার ক্ষেত্রে সরাসরি প্রযোজ্য নয়, তবে ঐতিহাসিক যে পরিবর্তনময়তার নিরিখে তিনি উৎসবধারা বিচার করে এর ভবিষ্যৎ বুঝে নিতে চাইছিলেন, সেটা আমাদের জন্যও প্রাসঙ্গিক বটে।

বাংলাদেশে বৈশাখি উৎসবের বিবর্তন আমরা বিগত শতকের মধ্যভাগ থেকে লক্ষ করে দেখতে পারি। এর আগেও আমরা যদি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং তার বিপরীতে শিক্ষিত বাঙালি জনগোষ্ঠীর অবস্থান বিচার করি, তাহলে স্বাদেশিকতার নানা তাগিদ সেখানে দেখতে পাই। স্বদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য জানা এবং সমাজের সংহতি গড়তে সাংস্কৃতিক উপাদান অবলম্বনের চেষ্টা তখনই বড়ভাবে দৃশ্যগোচর হয়। এই আন্দোলনে যেমন ছিল রবীন্দ্রনাথের সম্পৃক্তি, অনেক গান ও রচনার মধ্য দিয়ে তিনি যেমন দেশরূপ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, তেমনি পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে নানা উৎসব আয়োজনের মধ্য দিয়ে তিনি নব-উদ্ভূত বাঙালি মধ্যশ্রেণি ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে চেয়েছিলেন দেশসংলগ্ন করতে।

বাঙালি জীবন তো বারো মাসে তেরো পার্বণ দ্বারা খচিত ছিল, মূলত যা ছিল লোকায়ত জীবনধারার অঙ্গ। ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ লোকসংস্কৃতির সঙ্গে নগর-সংস্কৃতির ফারাক ক্রমে বাড়িয়ে তুলছিল। পাশাপাশি বাঙালি জীবনে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ ক্রমেই যে রক্তাক্ত সংঘাত ও তিক্ত রাজনীতির জন্ম দিল, তা স্থায়ী রূপ পেল দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রে, যেখানে ভাষা ও কৃষ্টি দ্বারা গড়ে ওঠা জাতিসত্তা লোপ করে ধর্মভিত্তিক নতুন ইসলামী জাতিসত্তা নির্মাণের জোরদার রাষ্ট্রীয় প্রয়াস গৃহীত হয়। এর বিপরীতে বাঙালির জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন, তার রক্তবীজ রোপিত হয় বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই ইতিহাস এবং পরবর্তী ঘটনাধারা আমাদের জানা। ভাষা ও সংস্কৃতি যে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিভাজন ছাপিয়ে অবিভাজ্য বাঙালি সংস্কৃতির ধারা বেগবান করে তুলতে লাগল, তার নানা বিচ্ছুরণ আমরা দেখতে পাই। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন ছিল এর অনিন্দ্য প্রকাশ, যার ফলে জন্ম নেয় ছায়ানট প্রতিষ্ঠান ও সংগীত শিক্ষার বিদ্যায়তন। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার সব সম্ভাবনা রোধ করে কঠোর সামরিক শাসন আরোপের পর যে রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, রাজনৈতিক দল ও কর্মকাণ্ডের ওপর নেমে আসা পীড়ন ও নিষেধাজ্ঞার সেই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে বাঙালি সমাজের মধ্যে এক অভিনব আলোড়ন সঞ্চারিত হয়, সব হারানোর পরও সংস্কৃতি হারিয়ে যায় না, মুছে যায় না আপন সত্তা—এমন এক বোধ হয়ে ওঠে প্রেরণামূলক।

১৯৬২ সাল থেকে ছাত্রদের প্রতিবাদ সংঘটিত হতে থাকে। এরপর ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও জাগে আলোড়ন, জেল-জুলুম উপেক্ষা করে বাঙালির অধিকারসচেতন রাজনীতি অর্জন করে প্রসারতা। অন্যদিকে ধর্মের অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহার দ্বারা সমাজের স্থিতি বিনষ্ট করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টাও চলে নানাভাবে। ১৯৬৪ সালে তুচ্ছ এক রটনা থেকে আবার বাধানো হয় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, পরের বছর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এই বৈরিতাকে রাষ্ট্রীয় সংঘাতের রূপ দেয়। এই পটভূমিকায় ১৯৬৬ সালের গোড়ায় বঙ্গবন্ধু, তখনো যিনি হয়ে ওঠেননি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, ঘোষণা করেন ছয় দফা দাবিনামা, বাঙালির জাতীয় সত্তা প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক ম্যাগনাকার্টা, যা ছিল ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিপরীতে জাতীয় অধিকারভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়। রাজনীতির এই রূপান্তরের পাশাপাশি ছায়ানট সংগীত বিদ্যায়তনের মাধ্যমে সংগীতচর্চা অর্জন করতে থাকে পুষ্টি, নানা সংগীতায়োজনের মাধ্যমে ছায়ানট বাঙালির সাংস্কৃতিক সত্তার উদ্ভাসন ঘটাতে থাকে। ঘরোয়া আয়োজন হলেও ঘর ছেড়ে বাইরে আসার তাগিদও সেখানে ছিল, ছিল জীবনের বড় অর্থ সামষ্টিকভাবে বুঝে নেওয়ার আকুতি, যেমনটা দেখা গিয়েছিল বলধা গার্ডেনে প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে নিবেদিত শারদোৎসব অনুষ্ঠানে। পহেলা বৈশাখে গানে গানে নতুন বছরকে বরণের রীতি অনুসরণ করে চলছিল ছায়ানট, ১৯৬৭ সালে আরো বড় পরিসরে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের তাগিদ থেকে রমনার বটমূলে, প্রকৃতপক্ষে যা ছিল অশ্বত্থতল, সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে ছায়ানট নিবেদন করল প্রভাতি সংগীতায়োজন। এই আয়োজন যেন বাঙালির হৃদয়তন্ত্রীতে নতুন ঝংকার তুলল, এক-দুই বছরেই তা রূপ নিল বিশাল মাত্রার সংগীত সভার, যার তুলনা আর বিশেষ মিলবে না। আধুনিক জীবনধারার মধ্যে বাঙালির বৈশাখ নিজ সত্তা সম্পর্কে সবাইকে সচকিত করতে পেরেছিল এবং বৈশাখি উৎসব প্রতীক হয়ে উঠল সব বাঙালির মিলনের; আত্মসত্তা ও আত্মপরিচয় ফিরে পাওয়ার স্ফূর্তি জোগাল বৈশাখ। বাঙালির সংস্কৃতি-সাধনা ও রাজনৈতিক সংগ্রাম এভাবেই পথ করে দিয়েছিল বাঙালির জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার, বহু ত্যাগ ও রক্তদানের মধ্য দিয়ে একাত্তরে ঘটেছিল যার অভ্যুদয়।

স্বাধীন বাংলাদেশে চার দশকেরও পরে বৈশাখি উৎসবের আমরা দেখি নানা বিস্তার ও পরিবর্তনময়তা। প্রভাতি সংগীতায়োজন এখন দেশব্যাপী অবশ্যপালনীয় রীতিতে পরিণত হয়েছে। লোকজীবনের বৈশাখি মেলা নগরজীবনে ঠাঁই করে নিতে পেরেছে। নব্বইয়ের দোরগোড়ায় প্রবর্তিত মঙ্গল শোভাযাত্রা অচিরেই ছড়িয়ে পড়েছে ছোটবড় নানা শহরে। পাশাপাশি অর্থনীতি আরো নানাভাবে স্থান করে নিয়েছে বৈশাখি আয়োজনে। সংস্কৃতিও খুঁজছে নতুন পথ ও অভিনবত্ব। একদিকে চিরায়ত ধারার সঙ্গে যোগ নিবিড়তর করার প্রয়াস যেমন চলছে, তেমনি তরুণতর গোষ্ঠী তাদের বাদন ও গীতিপ্রবণতা নিয়েই হাজির হতে চাইছে বৈশাখের দরবারে। বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রসার এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে সচলতা বৈশাখি উৎসব আরো বিস্তারিত ও সর্বজনীন করার শক্তি অনেকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। এর সঙ্গে বিভ্রান্তি ও বিভ্রমের যোগও ঘটছে নানাভাবে। বিনোদনের সংস্কৃতি ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রসার এবং বাজার সংস্কৃতির প্রভাব বৈশাখের তরল বাণিজ্যকরণ জোরদার করে তুলতে চাইছে। বাহ্যিক চাকচিক্য দিয়ে সৃষ্ট মোহ আবরণ বৈশাখের তাৎপর্য মুছে দিয়ে একে করে তুলতে চাইছে বিনোদনসর্বস্ব।

এমনি দোলাচলে বৈশাখ এসে আমাদের জানিয়ে দেয়, অনেক কিছু হারিয়ে গেলেও, অনেকভাবে পথভ্রষ্ট হলেও আমরা এখনো হারাইনি বাংলা মায়ের বোল, আমাদের পহেলা বৈশাখ; বরং চলছে নানাভাবে তাকে পাওয়ার সাধনা। জয় হোক চিরজীবী এই বৈশাখের।

মফিদুল হক

কালের কণ্ঠ ১৪ এপ্রিল ২০১৫

সবুজায়ন ও সামাজিক সচেতনতার অনন্য দৃষ্টান্ত

'গাছের চারাগুলো রোপণ করব বাড়ির পাশে। আমরা আমাদের পাড়াকে সবুজ করে তুলব। আর এভাবেই আমরা জলবায়ু পরিবর্তনকে রুখে দেব।' কথাটি শহীদ আবুল কাশেম মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী মাকসি হাসান মিথুর। রত্না রায়, নাসরিন খাতুন, কবিতা রায় ও দেলোয়ার হোসেনসহ সবার কণ্ঠে শোনা গেছে একই প্রত্যয়।

লালমনিরহাট সদর উপজেলার বড়বাড়ি ইউনিয়নের শহীদ আবুল কাশেম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু তার শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিয়েছেন সাতটি করে মোট ৮ হাজার গাছের চারা। আর দিয়েছেন যৌতুক, মাদক ও বাল্যবিয়ে বিরোধী স্লোগান লেখা একটি করে ছাতা।

সবার হাতে করে সবুজায়ন ও সামাজিক সচেতনতামূলক এসব স্লোগান পৌঁছে যাচ্ছে পুরো ইউনিয়নে, যা অনুপ্রাণিত করছে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদেরও।

১ আগস্ট ২০১৬ দুপুরে শিক্ষার্থীদের হাতে এসব উপকরণ তুলে দেন প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ। শিক্ষার্থীরাও উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছে এসব উপকরণ। আর এসবের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে সামাজিক দায়িত্ব পালনের স্পৃহা। তারা বলেন, লেখাপড়ার পাশাপাশি নিজ নিজ অবস্থানে থেকে এমন সামাজিক কাজ করার চেষ্টা করব।

প্রতিষ্ঠানটির রসায়ন বিভাগের প্রভাষক অবিনাশ রায় বলেন, 'কলেজের উদ্যোগে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আম, জাম, মেহগনি, নিম, আকাশমণি, কাঁঠালসহ সাতটি করে গাছের চারা দেয়া হয়েছে। এছাড়া সমাজকে ব্যাধিমুক্ত করতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দেয়া হয়েছে একটি করে ছাতা। এসব ছাতায় মাদক, বাল্যবিয়ে ও যৌতুকবিরোধী স্লোগান রয়েছে।'

একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী মণিমুক্তা বলে, 'আমি নিজে বাল্যবিয়ে করব না এবং এলাকায় বাল্যবিয়ে হতেও দেব না।' একই প্রত্যয় ছিল আরও অনেক শিক্ষার্থীর কণ্ঠে।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু বলেন, 'সামাজিক ও পরিবেশ সচেতনতার অংশ হিসেবে এ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার অংশ হিসেবে ফলদ ও বনজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে। পাশাপাশি রোদ-বৃষ্টিতে ব্যবহার উপযোগী ছাতার মধ্যে মাদক, বাল্যবিয়ে ও যৌতুকবিরোধী স্লোগান সংযুক্ত করা হয়েছে। এসব তৃণমূল মানুষকে সচেতন করতে সহায়ক হবে। শিক্ষার্থীরাও এতে বেশ উৎসাহ দেখিয়েছে।

রেজাউল করিম মানিক
জেলা প্রতিনিধি
বাংলামেইল২৪ডটকম, ০২ আগস্ট ২০১৬

লোকে যারে বড় বলে বড় সে হয়

আমি কেমন তা আমি জানি, তবে পুরোটা জানি না। অন্যের চোখে আমি কেমন সেটাই আমার আসল পরিচয়। কেননা নিজেকে নিজে ভালো জানা যথেষ্ট নয়। অন্যের চোখে আমাকে ভালো হতে হবে। লোকে যদি আমাকে ভালো বলে তবে তো আমি ভালো। আমি তো শুধু আমার জন্য না। অন্যের জন্যও আমি। অন্যেরা যেমন আমার জন্য আমরা পরস্পর পরস্পরের জন্য। আমি যদি অন্যের কাজে না আসতে পারি তাহলে আমার মধ্যে তো আমি বন্দি হয়ে গেলাম এবং অন্যের কাছ থেকে তাহলে তো আমি কোনো সাহায্যও পাব না।

আমার আচার-আচরণ আলাপ ব্যবহার আমার কার্যকলাপ অন্যের কাছে কীভাবে ধরা দিচ্ছে সে সম্বন্ধে আমাকে সজাগ থাকতে হবে। কেউ দুঃখ পেতে পারে, মনে কষ্ট নিতে পারে, কারো অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে, কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এ ধরনের কথা ও কাজ থেকে আমার বিরত থাকা উচিত। আবার একই সাথে আমার উচিত সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করা, অন্যের দুঃখে সমব্যথী হওয়া, বিপদে আপদে সাহায্যে এগিয়ে আসা। এভাবে যদি প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য কিছু করাকে দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করি তাহলে আমি, আমরা এবং আমাদের মধ্যে আনন্দ ও সুখ শান্তি বিরাজ করবে। এই জগৎ সংসারে আমরা সবাই এক পরিবারের সদস্য। আমাদের মধ্যে এই উপলব্ধি কার্যকর থাকলে হিংসা-বিদ্বেষবশত এবং ধর্ম, বর্ণ, বংশ ও অর্থনৈতিক অবস্থাভেদে সে ভিন্নতা ও বৈষম্য আর থাকে না। আমরা যদি পরস্পর থেকে নিরাপদ না হই তাহলে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হবে সবাইকে।

আমি আমার নিজের দোষত্রুটিসমূহ হয়তো নিজে অনেক সময় বুঝতে পারি না। এর জন্যে অন্যেরা কি বলছে সেটা দেখতে হবে। পরিবারে পিতা-মাতা মুরুব্বীজনেরা আমাদেরকে হরহামেশা নানা উপদেশ দিয়ে থাকেন। তাদের সে কথাগুলো আমার শোনা উচিত নিজের ভুল শোধরানোর জন্য, নিজের দোষত্রুটি বুঝবার জন্য এবং নিজেকে আরো ভালো করে গড়ে তোলার জন্য। বড়রা যে উপদেশ দেন তা তারা দিয়ে থাকেন তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে। তারা নিজেদের জীবনে ঠেকে ঠেকে যা শিখেছেন তার আলোকেই আমাদেরকে সাবধান হতে শেখান। আমরাও সে ধরনের ভুলের শিকার যাতে না হই, নিজেরাও যাতে তাদের দুঃখের কারণ না হই সেজন্য তারা নানান উপদেশ আদেশ ও নিষেধের দ্বারা আমাদেরকেও সহায়তা করতে চান। এ সবই তারা করেন আমরা যাতে সত্যিকার অর্থে আরো বড় হতে পারি। বড়রা ছোটদেরকে এভাবে বড় হতে সাহায্য করেন। আর এভাবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ ও সভ্যতা উন্নতি লাভ করে। জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, কর্মে একজন প্রকৃত বড় ব্যক্তি শুধু নিজে বড় নন–তিনি তার পরিবার, দেশ ও জাতি সকলের জন্য বড়। কেননা তাকে অন্যরাও অনুসরণ করে। তিনি তার নিজের জীবনের মহৎ কর্মের দ্বারা সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য অনেক কল্যাণ বয়ে আনেন। তাতে উপকৃত হয় অনেকে।

আমি যদি একটি গাছ লাগাই যে গাছ অনেককে অক্সিজেন দেবে, পাখপাখালীর আশ্রয়স্থল হবে, সে গাছের ফল অনেকে খেতে পারবে, সে গাছের ছায়ায় পথিকের ক্লান্তি দূর হবে। আমার এমন একটি কাজের দ্বারা অনেকের অনেক উপকার হবে। আমার উচিত 'অনেকের অনেক উপকার' হয় এমন ধরনের কাজ করা। আবার আমি যদি এমন একটা কাজ করি যেমন যদি ধূমপান করি তাহলে কী হবে–ধূমপানে আমার নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে, আমার ধূমপানের ধোঁয়া আশেপাশের অনেকের ফুসফুসে ঢুকে তাদেরও ক্ষতির কারণ হবে। ধূমপানের দূষিত ধোঁয়া পরিবেশকে করবে কলুষিত। ধূমপানের দ্বারা আমার এবং আমার পরিপার্শ্বের কী ক্ষতি হচ্ছে, তা উপলব্ধি করেই আমাকে ধূমপান থেকে বিরত থাকা উচিত। আমি যদি ভালো একখানা বই লিখি সে বই পড়ে পাঠক আনন্দ পাবে, শিক্ষা ও প্রেরণা পাবে কিন্তু আমি যদি একটা কুরুচিপূর্ণ বই লিখি তা পাঠ করে পাঠকের কুরুচির দিকে ঝুঁকে পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। সমূহ সর্বনাশের কারণ হবে সকলেরই। একজন ভালো লেখক, বড় মাপের চিত্রশিল্পী, নামকরা গায়ক, বরেণ্য অভিনেতা, আদর্শ শিক্ষক সকলের জন্য অনুসরণীয়। নিজের সাধনা দ্বারা তাঁরা বড় হয়েছেন। সবাই তাদের দ্বারা উপকৃত হন–পথের দিশা খুঁজে পান। পক্ষান্তরে একজন মন্দ চরিত্রের মানুষ তার নিজের জন্য তো বটে অনেকের জন্য দুঃখ ও বেদনার কারণ। মানুষ কিন্তু নিজেই নিজের আনন্দ ও বেদনার কারণ হয়ে যায়। আমার দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হোক, কষ্ট পাক এটা আমার কাম্য নয়। আমার সাধনা হবে আমার থেকে কোনো অনিষ্ট নয় ভালো কিছু যাতে অন্যেরা পায় এবং উপকৃত হয়। লোকে যখন আমাকে সেভাবে বড় হিসেবে দেখবে তখন আমি প্রকৃত বড় হব।

যারা নিজেকে বিদ্বান ও বড় মনে করে এবং অন্যের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই ছোট করে। কেননা নিজের বড়ত্ব জাহির করার বিষয় নয়, এর ফলে অহমিকা প্রকাশ পায়। অহমিকা নিজের দোষত্রুটি সম্বন্ধে নিজেকে অন্ধ করে দেয়। সেক্ষেত্রে নিজেকে দেখা বা শোধরানোর সুযোগ হয় লাপাত্তা। এমতাবস্থায় অন্যের কাছে নিজের অজ্ঞাত দোষত্রুটি ধরা পড়ার ফলে অপমানিত হতে হয়। আত্মসচেতন কোনো মানুষ অহমিকায় অন্ধ হতে পারে না। তার এই একান্ত ইচ্ছা বরাবরই বলবৎ থাকে যে, যে কোনো প্রতিকূল পরিবেশও নিজের আত্মসম্মানবোধ যেন জাগ্রত থাকে।

বড় হওয়ার জন্য জ্ঞানার্জন প্রয়োজন। জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানের আলোকে অন্তরে ও বাহিরে দেখা জানা ও শোনার শক্তি বেড়ে যায়। শেখ সাদীর গুলিস্তাঁর সেই মহান বাণী চিরস্মরণীয়–

বয়সে না বড় লোক, বড় হয় জ্ঞানে;
জ্ঞান শ্রেষ্ঠতম ধন সকলেই জানে
টাকা থাকিলেই লোকে ধনী নাহি হয়
জ্ঞানীই প্রকৃত ধনী, নাহিকো সংশয়।

জ্ঞানার্জনের জন্য শ্রম ও অধ্যবসায় আবশ্যক। আলোকিত মনের অধিকারী হতে চাই লেখাপড়ার প্রতি মনোনিবেশ। নানান বাধাবিপত্তি অলসতা, অনিয়মের বাধা-বিপত্তি পাঠাভ্যাসে বিঘ্ন ঘটাতে পারে–তাকে অতিক্রম করতে হবে। জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) যেমনটি বলেছেন–

পাছে কোন বিঘ্ন হয়, এই ভাবি মনে
কার্যে নাহি হাত দেয় যত নিচ জনে।
একবার বাধা পেলে মধ্যম যে জন,
হতাশ হইয়া করে চেষ্টা বিসর্জন।
কোন কাজ ধরে যদি উত্তম যে জন,
হউক সহস্র বিঘ্ন ছাড়ে না কখন।

মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
সাবেক সচিব, ইআরডি ও চেয়ারম্যান, এনবিআর
মেম্বার, গভর্নিং বোর্ড, এইচডিএফ

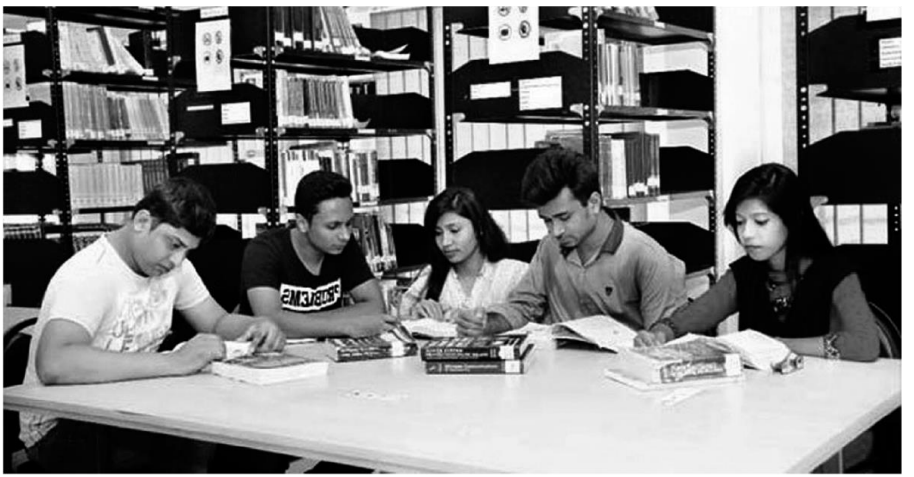

বিসিএস : লিখিত পরীক্ষার মহারণে : ২য় পর্ব

বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার নানা কলাকৌশল নিয়ে বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ দিয়েছেন বিগত পরীক্ষার শীর্ষ মেধাবীরা। এ পর্বে ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র বিষয়ে লিখেছেন ৩৫তম বিসিএসে প্রথম (পররাষ্ট্র ক্যাডার) মো. ওয়ারিসুল ইসলাম

বিসিএসে লিখিত পরীক্ষায় ভালো করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইংরেজি। এ বিষয়ে ভালো করার মানে প্রতিযোগিতার দৌড়ে অন্য সবার থেকে এগিয়ে যাওয়া। আর খারাপ করলে গড় নম্বর অনেক কমে যাবে।

কী আছে ইংরেজিতে?

পার্ট 'এ' এবং পার্ট 'বি' মিলিয়ে মোট ২০০ নম্বর বরাদ্দ আছে। রিডিং কম্প্রিহেনশন থেকে ১০০ নম্বর, যা সাধারণ প্রশ্ন ৩০, ব্যাকরণ ৩০, সম্পাদকের কাছে চিঠি ২০ এবং সারাংশ ২০ নম্বর যোগ করলে পাওয়া যায়। আর পার্ট বি-তে বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ ২৫, ইংরেজি থেকে বাংলা ২৫ এবং রচনায় ৫০সহ মোট ১০০ নম্বর। সর্বমোট ২০০ নম্বর।

কী কী জানতেই হবে

ইংরেজি শুদ্ধভাবে লিখতে হবে। এ ক্ষেত্রে সবার আগে Right form of verbs-এর ওপর পূর্ণ জ্ঞান থাকা চাই। অ্যাকটিভ-প্যাসিভ ফর্ম ও টেন্সের সঠিক ব্যবহার, বিভিন্ন ধরনের সেনটেন্সের স্ট্রাকচার সম্পর্কে জানলে ইংরেজি ভালো করা সহজ হয়। Simple, Complex ও Compound Sentence-এর স্ট্রাকচার, ট্রান্সফরমেশন সম্পর্কে পড়তে হবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় Word-এর Different formation. একটি Word-কে কীভাবে Noun/Verb/Adjective-এ রূপান্তর করা যায়, তা দেখে নিতে হবে। এ ছাড়া গ্রামারের ব্যবহারের ওপর ধারণা থাকতে হবে।

কীভাবে পড়বেন?

মনে রাখবেন, ইংরেজির ব্যবহার করতে হবে শুদ্ধভাবে, গ্রহণযোগ্যভাবে। প্রথমে নিজের মনে বিশ্বাস রাখুন, ইংরেজি ভাষা অনেক সহজ। আপনি Grammar পড়ছেন না, একটি ভাষা শিখছেন। ইংরেজির ওপর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যেকোনো ভালো Grammar বই থেকে Basic Grammar-এর Usage দেখে নিন। প্রয়োজনে যাঁরা ইংরেজিতে দক্ষ, তাদের কাছ থেকে সহায়তা নিন। যেকোনো ইংরেজি লেখা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করুন। ইংরেজি পত্রিকা পড়ুন। Sentence

Structure, Word usage, Linker usage ও অনুবাদের প্রস্তুতির জন্য একই ঘটনার ওপর বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার রিপোর্টে চোখ বোলান। অনেক বহুল ব্যবহৃত শব্দের অর্থ, সমার্থক শব্দ অবচেতন মনেই আপনি জেনে ফেলবেন। অনেক প্রশ্নই সমসাময়িক বিষয়ের ওপর হয়। তাই ইংরেজি পত্রিকা পড়ার অভ্যাস বিস্ময়কর ফল নিয়ে আসতে পারে।

বাজার থেকে ভালোমানের যেকোনো একটি ইংরেজি লিখিত পরীক্ষার গাইড সংগ্রহ করে নিন। বিগত বছরের প্রশ্নও দেওয়া থাকে এতে। অনুশীলনের ক্ষেত্রে এটি কাজে লাগবে।

ভালো করার উপায়

দশম থেকে ছত্রিশতম বিসিএসের ব্যাকরণ অংশটি ভালো করে পড়ে নিন। কম্প্রিহেনশন যত পারেন পড়ুন। ইংরেজি পত্রিকার সমসাময়িক তাৎপর্যপূর্ণ কলাম বা লেখা পড়তে পারেন। ৩৫তম বিসিএসে পত্রিকার একটি খবর থেকেই প্যাসেজ এসেছিল। ব্যাকরণ অংশে প্রিলিতে যা পড়েছেন তা-ই সই! সেসব পড়াই বারবার রিভিশন দিন। প্যাসেজ থেকেই সামারি করতে হয়। এ ক্ষেত্রে নিজের মতো করে লিখতে হবে। সম্পাদকের কাছে চিঠি পড়ার তেমন কিছু নেই। শুধু নিয়মকানুন জেনে রাখুন। তাতেই হবে। আর দুই পৃষ্ঠার বেশি লিখবেন না। যত পারা যায় শব্দের অর্থ শিখুন। প্রচুর অনুশীলন করুন। ফ্রি হ্যান্ডরাইটিংয়ের জন্য অনুশীলন অনেক কাজে দেয়। প্রতিদিন একটা টপিক ধরে এক পৃষ্ঠা করে লেখার চর্চা করুন। টেন্স ও প্রিপজিশন সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণার জন্য চৌধুরী অ্যান্ড হোসাইনের এসএসসি ইংলিশ সেকেন্ড পেপার বইটি পড়তে পারেন। ভাবানুবাদ করতে হবে, আক্ষরিক অনুবাদ করতে যাবেন না। থিমটা বোঝাতে পারলেই নম্বর আসবে। রচনা কী আসবে বলা কঠিন। তবে দশ-

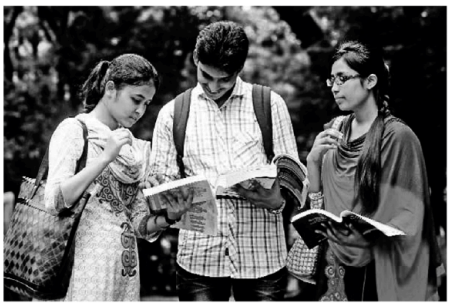

বারোটি কমন টপিকস সম্পর্কে ধারণা নিয়ে গেলে লিখে আসতে পারবেন।

কী লিখব? কীভাবে লিখব?

পরীক্ষার দিন লেখা শুরুর আগের কাজ হলো মাথা ঠান্ডা রাখা। কোনো প্রশ্ন, শব্দ ও বাক্য বুঝতে না পারার মানে পুরো পরীক্ষা খারাপ হওয়া নয়। তাই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরীক্ষা দিন। চেষ্টা করুন নির্ভুল ইংরেজি লিখতে। ভুল ও জটিল বাক্য লেখার থেকে ছোট ছোট সরল বাক্য লেখা শ্রেয়। রচনা ও চিঠিতে চেষ্টা করুন তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরতে। অনুবাদ যত বড় হোক, হুবহু অর্থ না লিখে ভাবানুবাদ করুন। শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে মূল ভাব তুলে ধরুন। কী লিখবেন সেটা বড় কথা না, কীভাবে লিখবেন সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। খাতার উপস্থাপনার ওপর জোর দিন। একটু চেষ্টা করলেই ইংরেজিতে ভালো করা সম্ভব।

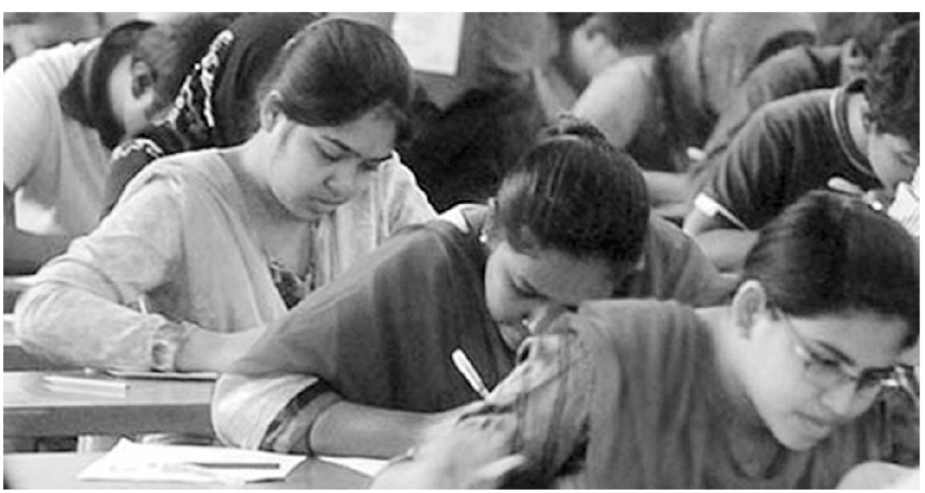

ভিন্ন মানুষ ভিন্ন জীবন

বুলবুল আহমেদ
সদস্য নং ৬৪৭/২০০৫

'এই যে ভাই...'
'বলুন কি চাই'
'একটু দাঁড়ান
হাতটা বাড়ান।
হাত রেখে হাতে
আসুন আমার সাথে।
কিছু কথা বলি।'
'না, না চলি;
সময় যে নাই।'
'কি যে বলেন ভাই–
দেখুন না কত পাখি গাছে
একটু আসুন
পাশে বসুন
কত সময় আছে।
কত সুন্দর প্রকৃতি
ফুল, ফসল, পাখি
এসব দেখে কোন মানুষের
জুড়িয়ে যায় না আঁখি।'
'জানি রে ভাই আছে
পৃথিবীতে অনেক মানুষ
প্রকৃতিতে হারিয়ে গেলে
আর থাকে না হুঁশ।
আমি তো ভাই,
সে দলে নাই।
অনেক আমার কাজ
এত কাজ ফেলে
প্রকৃতিতে হারিয়ে গেলে
ঘনিয়ে আসবে সাঁঝ।'
'কেন,
সাঁজ আসবে কেন?'
'সব মানুষের জীবনটা তো
হেসে খেলার নয়
জীবন পথে চলতে আমার
কত কষ্ট হয়।
বসে বসে থাকলে আমার
কাজও থাকবে বসে।
জীবন পথে আমি তখন
পড়ে যাব ধ্বসে।
এখন তাই,
চলিরে ভাই।
তোমার কাজ তুমি কর
আমার কাজ আমি
সামনে আমার কত বাধা
জানে অন্তর্যামী।'

নবীন, পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৭

আত্মশুদ্ধি

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
সদস্য নং ০৮/২০০৫

অভাবে আমার দুঃখ হয় না
রোগে শোকের যাতনা ভুলতে পারি
কিন্তু আমার নিচতার জন্য যে দুঃখ
তার তুলনা নাই।
আমার প্রবৃত্তি যদি পশুর মতো হয়
যদি তার হীনতায় আমি লজ্জিত না হই
কেন আমি পশু আকার তবে ধারণ করি নাই?
প্রতিদিন কত মিথ্যাই না বলি
তাতে অন্তর মানুষ লজ্জিত হয় না,
আল্লাহর কালাম অন্যায় হতে রক্ষা করে না,
অন্যের দোষে আঘাত করি
নিজের দোষের পানে এতটুকুও চাই না।
অন্ধকারে নিজের মনের দিকে চেয়ে দেখি না
কত কালি, মিথ্যা, প্রতারণা জমা আছে
নিজের অপরাধবোধে লজ্জা নেই।
মানুষ চুরি করতে দেখেনি
তাই বলে আমি চোর নই?
অন্তরের পাপ মুখখানি একবার দেখি
যদি অন্যায় করে কারো মনে
আঘাত দিয়ে থাকি
তবে গোপনে ক্রন্দন করি।

নবীন, ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি-এপ্রিল ২০০৮

আমি আজ আর অবাক হই না

শেফালী খাতুন
সদস্য নং ৫৯৫/২০০৪

শৈশবে আমি খুব অবাক হতাম
আমাদের পুকুরে ভাসমান হাঁসগুলো দেখে
বাবাকে একদিন বলেছিলাম 'আমিও ভাসব'
উত্তর এসেছিল 'বড় হও; সাঁতার শেখো, তারপর ভাসো'
পাল্টা প্রশ্ন করেছিলাম–
'যে হংস শিশুটির জন্ম হয়েছে কাল
তার মাথা কি আকাশ ছুঁয়েছে?
এর কি ডিমের ভেতর আছে
কোনো সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!'
বাবা উত্তর কী বলেছিলেন আমার ঠিক মনে নেই।
একদিন দিনভর বৃষ্টি দেখে প্রশ্ন জেগেছিল–
আকাশে এত পানি কীভাবে আসে!
কিন্তু আজ আমি আর অবাক হই না
পৃথিবীর চেয়ে লক্ষ-কোটি গুণ
বড় কোনো গ্রহ-নক্ষত্রের নাম শুনেও
অথবা বিস্মিত হই না
এক নিমিষে টুইন টাওয়ার উড়ে যাবার ঘটনায়,
কারণ–এখন আমি জানি।
যিনি এসবের নিয়ন্ত্রক
তার ক্ষমতা কত অসীম।

নবীন, ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি-এপ্রিল ২০০৮

নেট ইশকুলে যাই

সময় বাঁচে, খরচও। এটা ভার্চুয়াল পাঠশালা। ছোট থেকে বড়-সবাই পড়তে পারে এখানে। ইংরেজি, অঙ্ক, বাংলা, বিজ্ঞান, কম্পিউটার–সবই আছে।

শহিদুল ইসলাম কাজ করেন সফটওয়্যার নিয়ে। মাঝেমধ্যে ওয়েব ডেভেলপও করেন। আর তা করতে গিয়ে ঝামেলায় জড়িয়ে যান। 'পিএইচপি' যে রপ্ত করা হয়নি, ফলে কিছু কাজ জট পাকিয়ে যায়। তাই পিএইচপি শেখাটা জরুরি হয়ে পড়ল শহিদুলের। এদিকে সকাল-সন্ধ্যা অফিস করে সময় আর থাকে না। ভেবেচিন্তে একদিন অনলাইনে সার্চ দিলেন, চোখে পড়ল বেশ কিছু সাইট। একটু ঘাঁটাঘাঁটি করতেই পেয়ে গেলেন টিউটরিয়ালও। আস্তে আস্তে ধারাবাহিক পর্বগুলো দেখে মোটামুটি শিখেও ফেললেন পিএইচপি।

শুধু ওয়েব বা সফটওয়্যার ডেভেলপই নয়, দরকারি অনেক বিষয়ের পাঠ বা টিউটরিয়ালের বিশাল সংগ্রহশালা আছে অনলাইনে। সঠিক ধারণা ও সহজ উপস্থাপনের কারণে সাইটগুলো খুবই জনপ্রিয়।

শিক্ষক ডটকম : ভার্চুয়াল শিক্ষক

২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে চালু হয় 'শিক্ষক ডটকম' (www.shikkhok.com)। এখানে কঠিন বিষয়গুলোকে সহজ করে দিচ্ছেন ভার্চুয়াল শিক্ষকরা। বাংলায় বিভিন্ন বিষয়ের লেকচার ভিডিওতে ধারণ করে যুক্ত করা হচ্ছে ওয়েবসাইটে, আর এসব পাঠ ঘরে বসেই পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। আন্তর্জাতিক পুরস্কার জেতা এ সাইটের প্রতিষ্ঠাতা ড. রাগিব হাসানও পেশায় শিক্ষক। তিনি জানান, সাইটের পাঠগুলো নিয়মিত চর্চা করলে ছাত্রের আর কোচিং, নোট, সাজেশন বা গাইড বইয়ের দরকার পড়বে না। কিছু ভিডিও কোর্স শিগগিরই ডিভিডি আকারে প্রকাশ করা হবে বলেও জানান তিনি। বিনা খরচে যে কেউ এখানে পাঠ নিতে পারে।

সাইটটিতে এখন চালু আছে বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদির ওপর বিভিন্ন ভিডিও পাঠ। কোর্সগুলো কাজে আসবে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের।

সিলেবাসের বাইরের বিষয়ের কোর্সও অন্তর্ভুক্ত আছে সাইটটিতে।

শিক্ষার্থী চাইলে নতুন কোনো বিষয়ের ভিডিও কোর্স চালুর অনুরোধও রাখতে পারে। কোনো শিক্ষক পাঠদান করতে আগ্রহী হলে যুক্ত হতে পারেন ভার্চুয়াল পাঠশালার সঙ্গে।

সৃজনশীল : বইয়ের পড়া ওয়েবে

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষায় ভালো করার উপায় হলো পাঠ্য বইয়ের পড়াগুলো ভালোভাবে বোঝা। সেই সঙ্গে নিয়মিত অনুশীলন। প্রস্তুতি কেমন হয়েছে, তা-ও যাচাই করতে হয়। এসব সুবিধা পাওয়া যাবে 'সৃজনশীল ডটকমে'। ঘরে বসেই সিলেবাস অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা মডেল টেস্ট দেওয়ার সুযোগ পাবে এই ওয়েবসাইটে। বিভিন্ন শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষার মডেল

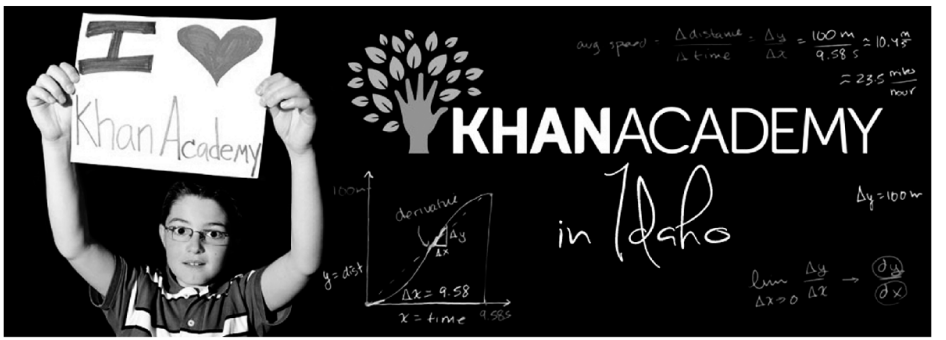

টেস্টের তালিকা পাওয়া যাবে www.srijonshil.com/allexams.php লিংকে। টেস্ট শেষে দেখা যাবে প্রাপ্ত নম্বর।

শিক্ষক বাতায়ন : ভার্চুয়াল মেলবন্ধন

পাঠ্য বইয়ের বিভিন্ন দরকারি বিষয় নিয়ে আলোচনা, জটিল বিষয়ের সম্ভাব্য সহজ সমাধান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পাচ্ছেন শিক্ষকরা। আর এ আলোচনার ক্ষেত্র হচ্ছে 'শিক্ষক বাতায়ন' (www.teachers.gov.bd)।

এ সাইটকে বলা হয় শিক্ষকদের ভার্চুয়াল মেলবন্ধন। এখানে দক্ষ শিক্ষকদের পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন সাধারণ শিক্ষকরা। দেশসেরা স্কুলের শিক্ষকের সঙ্গে গ্রামের একজন শিক্ষকের অভিজ্ঞতা বিনিময়ও সম্ভব হবে। শিক্ষকরা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তৈরি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বা ডিজিটাল কনটেন্ট যেমন অনলাইনে প্রকাশ করতে পারবেন, তেমনি অন্যের কনটেন্ট বা আলোচনা নামিয়ে তা নিজের ক্লাসেও ব্যবহার করতে পারবেন। উপযোগী কনটেন্টগুলো মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের জন্য ব্যবহার করা হবে।

২০১৩ সালের ১৬ মে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের 'এক্সেস টু ইনফরমেশন' (এটুআই) প্রকল্পের পরিকল্পনায় সাইটটি বাস্তবায়নে কাজ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আর কারিগরি সহায়তা দিয়েছে 'রাইন ব্রেইন সলিউশন'।

বিজয় শিশু শিক্ষা : টার্গেট ৪-৬ বছরের শিশুরা

চার থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুদের জন্য তৈরি করা হয়েছে 'বিজয় শিশু শিক্ষা' (www.bijoydigital.com)। সব পাঠই তৈরি করা হয়েছে এনিমেশনের মাধ্যমে। খেলতে খেলতে শেখার পাশাপাশি আছে বর্ণমালা, সংখ্যা, লিখতে শেখা, ছড়া, গল্প, রং করা ইত্যাদি। শিশুদের উপযোগী করে বাংলা ও ইংরেজি শেখার সুযোগও রাখা হয়েছে এ সাইটে।

খান একাডেমি : ভিডিও দেখে শেখা

অসাধারণ সব ভিডিও টিউটরিয়ালের কারণে 'খান একাডেমি'র (www.khanacademy.org) সুনাম দুনিয়াব্যাপী। তবে বাংলাদেশিদের কাছে সাইটটির কদর একটু বেশিই। কারণ এর প্রতিষ্ঠাতা সালমান খান বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর করা ভিডিও টিউটরিয়ালের আছে বিশাল সংগ্রহ এ সাইটে। ভিডিওগুলো ইংরেজি, বাংলার পাশাপাশি আরো কিছু ভাষাতেও আছে। সাইটটির তুমুল জনপ্রিয়তার কারণ হচ্ছে, জটিল সব বিষয়কে ভিডিওর মাধ্যমে সহজভাবে উপস্থাপন করা হয় এখানে।

যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটি থেকে স্নাতকধারী সালমান সাইটটি চালু করেন ২০০৬ সালে। এ পর্যন্ত সাইটে কম্পিউটার সায়েন্স, বীজগণিত, রসায়ন, ক্যালকুলাসসহ বিভিন্ন বিষয়ের অসংখ্য টিউটরিয়াল যুক্ত হয়েছে। ফেইসবুক ও জিমেইল ব্যবহারকারীরা লগইন করেই শুরু করতে পারবে ভার্চুয়াল পাঠ। ওয়েবের পাশাপাশি স্মার্টফোনেও পাওয়া যাবে টিউটরিয়াল। এর জন্য খান একাডেমির একটি অ্যাপ নামিয়ে নিতে হবে অ্যাপ স্টোর বা প্লে স্টোর থেকে।

ডাব্লিউ থ্রি স্কুলস : ডেভেলপারদের পাঠশালা

ওয়েব ডেভেলপের প্রায় সব পাঠই পাওয়া যাবে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলসে (www.w3schools.com)। সাইটটিকে ওয়েব দুনিয়ার কারিগরদের প্রথম স্কুল বললে ভুল হবে না। এইচটিএমএল বা সিএসএস, জাভা স্ক্রিপ্ট, এসকিউএল, পিএইচপি, এএসপি, ভিজ্যুয়াল বেসিক, এক্সএমএল ছাড়াও ওয়েব বিল্ডিংয়ের যাবতীয় খুঁটিনাটি রাখা হয়েছে এ সাইটে। উদাহরণের পাশাপাশি কোন টুলের কী কাজ, কোন ব্রাউজারে চলবে, তা-ও বলা হয়েছে।

ইচ্ছে কোড : বাংলায় প্রোগ্রামিং

বাংলাভাষীদের কাছে প্রোগ্রামিংকে সহজভাবে উপস্থাপন ও কায়দাকানুন শেখানোর জন্য চালু হয়েছে ইচ্ছে কোড স্কুল (www.icchecode.com)। প্রোগ্রামিং ভাষা (সি, সি++, জাভা, পাইথন) ছাড়াও ওয়েব ডিজাইন (এইচটিএমএল, সিএসএস, পিএইচপি) শেখার বাংলা টিউটরিয়াল পাওয়া যাবে এই অনলাইন স্কুলে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে চালু হওয়া সাইটটি বয়সে নতুন হলেও প্রোগ্রামিংয়ে আনাড়িদের বেশ কাজে আসবে। কোর্সগুলো ধাপে ধাপে সাজানো। আর কোডের নমুনার সঙ্গে আছে প্রিভিউ, তাই আউটপুট কেমন হবে—আগে থেকেই ধারণা পাওয়া যাবে।

■ হাবিব তারেক
কালের কণ্ঠ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪

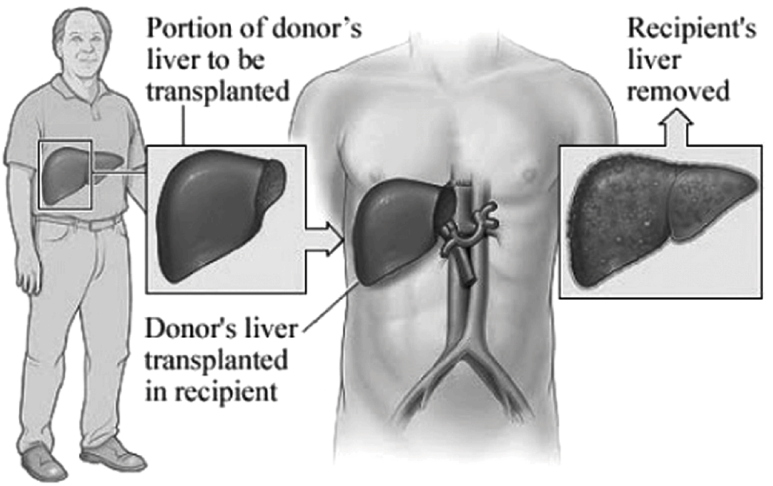

অঙ্গ প্রতিস্থাপন বাংলাদেশও এগিয়ে যাচ্ছে

ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে লিভার নষ্ট হয়ে যাওয়া এক রোগীর শরীরে আরেকজনের লিভার প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ওই অপারেশনে ২৪ সদস্যের সার্জন দলের প্রধান ছিলেন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী।

সহজ ভাষায় ট্রান্সপ্লান্ট মানে হলো, একটি অঙ্গের পরিবর্তে একই স্থানে একই রকম আরেকটি অঙ্গ বসিয়ে দেওয়া। যেমন–একটি কিডনির জায়গায় আরেকটি কিডনি বসিয়ে দেওয়া। সাধারণত কোনো দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত বা ইতিমধ্যে অসুস্থতার জন্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গের স্থানে অন্য কারো দেহ থেকে ওই একই অঙ্গ এনে আক্রান্তের শরীরে বসিয়ে দেওয়া হয়। মেডিকেলের ভাষায় এটাই ট্রান্সপ্লান্ট।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির কল্যাণে বিশ্বজুড়ে মানুষের বেশ কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ট্রান্সপ্লান্ট করা হচ্ছে অনেক বছর ধরে। বাংলাদেশেও কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট শুরু হয়েছে কয়েক বছর আগে থেকেই। এখন সে তালিকায় যোগ হলো লিভারও।

লিভার ট্রান্সপ্লান্ট

গত ৩ জুন বারডেম হাসপাতালে সফলভাবে প্রথম লিভার ট্রান্সপ্লান্ট অপারেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। উন্নত বিশ্বে, এমনকি প্রতিবেশী দেশগুলোয় অনেক আগে থেকেই লিভার ট্রান্সপ্লান্ট শুরু হলেও আমাদের দেশে এতদিন তা সম্ভব হয়নি। টেকনিক্যাল জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার জন্যই মূলত আটকে ছিল চিকিৎসাটি। বারডেম হাসপাতালের হেপাটোবলিয়ারি ও প্যানক্রিয়েটিক বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে ২৪ জন সার্জন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দেশের প্রথম লিভার ট্রান্সপ্লান্টটি সম্পন্ন করেন।

লিভার ট্রান্সপ্লান্ট কাদের করতে হয়

লিভার বা যকৃত শরীরের এমন একটি অঙ্গ যা অনেক শরীর বৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন করে। এটি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেলে এ কাজগুলো করা সম্ভব হয় না। ফলে, ধীরে ধীরে নিভে আসতে থাকে জীবনপ্রদীপ।

কিছু কিছু রোগের কারণে লিভার হঠাৎ অকেজো হয়ে গেলে বা দীর্ঘদিন অকেজো হতে থাকলে লিভার প্রতিস্থাপন করতে হয়। এর মধ্যে সিরোসিস অন্যতম। নানা কারণে সিরোসিস হতে পারে। এর মধ্যে হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস, বিলিয়ারি অ্যাট্রেসিয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া অনেক সময় ভাইরাল হেপাটাইটিস, অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস ইত্যাদি কারণে হঠাৎ লিভার অকেজো হয়ে যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রেও লিভার ট্রান্সপ্লান্টের প্রয়োজন হতে পারে।

কখন লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করতে হয়

দীর্ঘস্থায়ী লিভার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি রোগের শেষ পর্যায়ে এসে রোগী অল্পতেই দুর্বল হয়ে পড়লে, ওজন কমে গেলে, পায়খানা বা বমির সঙ্গে রক্ত এলে, রক্তে অ্যালবুমিনের মাত্রা কমে গেলে, পেটে পানি জমে গেলে এবং সর্বোপরি বারবার হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন হলে রোগীর লিভার ট্রান্সপ্লান্ট অনিবার্য হয়ে পড়ে।

লিভার কীভাবে সংগ্রহ করা যায়

যেকোনো প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষ লিভার দান করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে জীবিত ব্যক্তির লিভারের পুরোটা নেওয়া হয় না। সাধারণত নিকটাত্মীয়দের মধ্যে এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। দাতার বয়স ১৮ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে হতে হবে এবং রোগীর সঙ্গে তাঁর রক্তের গ্রুপের মিল থাকতে হবে।

আবার কোনো রোগীর ব্রেইন ডেড হলে বা ডাক্তার তাকে ক্লিনিক্যালি ডেড ঘোষণা করলে ওই ব্যক্তির লিভার যদি সচল থাকে তবে তা সংগ্রহ করে অন্য মানুষের শরীরে প্রতিস্থাপন করা যায়। তবে এই দানটি করতে হবে ক্লিনিক্যালি মৃত লোকটির নিকটাত্মীয়দের।

দাতার সমস্যা হবে না

মানুষের লিভারের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর বেশিরভাগ অংশ কেটে ফেললেও খুব দ্রুত তা পূরণ হয়ে যায় বা আকারে বড় হয়ে কাটা অংশটুকু পূরণ করে ফেলে। তাই দাতার কোনো সমস্যা সাধারণত হয় না। লিভার দান করার ছয় থেকে ১২ সপ্তাহের মধ্যে তার লিভার আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। নতুনভাবে গজিয়ে ওঠা লিভার তাঁকে আবার স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেয়।

গ্রহীতার সমস্যা

আগে থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয় বলে গ্রহীতার তেমন কোনো সমস্যা হয় না। তাঁর দেহে প্রতিস্থাপিত লিভার খুব দ্রুত বড় হতে থাকে এবং স্বাভাবিক মানুষের মতোই তিনি কাজকর্মে ফিরে যেতে পারেন। তবে ইনফেকেশন, উচ্চ রক্তচাপ, ওজন বৃদ্ধি, ডায়াবেটিক, কিডনির জটিলতা ইত্যাদি সমস্যা অনেক সময় দেখা দেয়।

এসব সমস্যা প্রতিরোধে অপারেশনের পর নিয়মিত ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে, সুষম খাবার খেতে হবে, অ্যালকোহল খাওয়া যাবে না একটুও। মহিলাদের ক্ষেত্রে অপারেশনের প্রথম এক বছর কোনো সন্তান নেওয়া যাবে না।

অপারেশনের ব্যয়

বাংলাদেশে এ জাতীয় অপারেশন এবারই প্রথম। অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী ও তাঁর সহকারীরা এ অপারেশন বিনামূল্যে করেছেন। পাশাপাশি বারডেম কর্তৃপক্ষও কোনো ধরনের টাকা নেয়নি। রোগী শুধু আনুষঙ্গিক ওষুধপত্র, রক্ত ইত্যাদি কিনেছেন। তবে সব ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তেমন হবে না। আনুমানিক হিসাবে দেশে এ অপারেশন করতে ৩০ থেকে ৩৫ লাখ টাকা খরচ হবে। প্রতিবেশী দেশগুলোয় এ খরচ ৭০ লাখ থেকে এক কোটি টাকা এবং উন্নত বিশ্বে প্রায় দুই কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

একটি আবেদন

বাংলাদেশে প্রথম লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি দলের প্রধান সবার উদ্দেশে একটি আবেদন রেখেছেন। 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দান হলো নিজের শরীরের কোনো অংশ বা অংশবিশেষ দান করা। প্রিয়জনের প্রয়োজনে আমরা যেমন নিজেরাই রক্ত কিংবা কিডনি দান করতে পারি, তেমনি লিভারের অংশবিশেষ দান করা যেতে পারে। এতে লিভারদাতার কোনোই সমস্যা হয় না।' অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলীর এ আবেদনে সাড়া দিলে আমাদের এ ধরনের অসহায় রোগীদের আর অকালে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে না।

কী কী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ট্রান্সপ্লান্ট করা যায়

অনেক আগে থেকে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট শুরু হয়েছে। অধুনা মানুষের পুরো মুখ ট্রান্সপ্লান্ট করে বদলে দেওয়া হচ্ছে। সফলভাবে ট্রান্সপ্লান্ট করা সম্ভব হচ্ছে লিভারের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। হৃৎপিণ্ড বন্ধ হওয়া মানেই জীবন থেমে যাওয়া। এ অঙ্গটিও সংযোজন করা এখন আর স্বপ্ন নয়। পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি দেশেই এ অপারেশন সম্ভব হচ্ছে। এসব ট্রান্সপ্লান্টে বিপ্লব এনেছে স্টেম সেল। স্টেম সেলের মাধ্যমে সিমেন্টের ডাইসের মতো মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি করে তা অনায়াসে ট্রান্সপ্লান্ট করা সম্ভব হচ্ছে। ধরুন আপনার নাকের কথা। ওটা আপনার মনমতো না হলে স্টেম সেলের সহায়তায় পছন্দের শেপ অনুযায়ী নাক তৈরি করে তা আপনার অসুন্দর নাকের জায়গায় বসিয়ে দেওয়া সম্ভব। দাঁত ট্রান্সপ্লান্টের ইতিহাসও বেশ পুরনো। এ ছাড়া ফুসফুস, অগ্ন্যাশয়, অন্ত্র, পাকস্থলী, শুক্রাশয়, হাত, কর্নিয়া, ত্বক বা মুখমণ্ডল, অস্থিমজ্জা, হার্ট ভাল্ব, হাড়, দাঁত, রক্তনালির ট্রান্সপ্লান্ট এখন হরহামেশাই করা হচ্ছে। আমাদের দেশেও কিছু কিছু ট্রান্সপ্লান্ট চালু হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, প্রযুক্তিগত সহায়তা সহজলভ্য হলে এ দেশে সব ধরনের ট্রান্সপ্লান্ট করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশি রোগীদের লিভার ট্রান্সপ্লান্ট লাগতে পারে?

বাংলাদেশে লিভার রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। যদিও এ দেশে অ্যালকোহলে আসক্ত মানুষের সংখ্যা খুবই কম। তবে প্রায় ৬ শতাংশ লোক হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসে আক্রান্ত। নিশ্চিন্তভাবে জানা না গেলেও ধরে নেওয়া হয় শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ লোক ফ্যাটি লিভারে ভুগছে। এসব রোগের জটিলতায় লিভার সিরোসিস বা লিভার ক্যান্সার হতে পারে। এ ছাড়া বাংলাদেশে হেপাটাইটিস-ই ভাইরাস বা সাধারণ জন্ডিসের প্রকোপ অনেক বেশি। এ কারণে অনেকে সময় হঠাৎ লিভার বিকল হয়ে যেতে পারে। এসব কারণে লিভার ট্রান্সপ্লান্টের প্রয়োজন হতে পারে।

লিভার দান করলেও দাতার ক্ষতি হয় না কেন?

দেখুন, মাত্র ৩০ শতাংশ লিভার নিয়ে একজন মানুষ সম্পূর্ণ সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে। তাই আপনার লিভারের বড় একটি অংশ দান করার পরও আপনার কোনো ক্ষতিই হয় না। অন্যদিকে লিভার দান করার দুই মাসের মধ্যে তা আবার নতুন করে গজিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে পায়। ফলে লিভার দাতা বা গ্রহীতা মাত্র দুই-তিন মাসে স্বাভাবিক লিভারের অধিকারী হয়ে ওঠেন।

সিঙ্গাপুরে এ ধরনের অপারেশনের সফলতার হার কেমন?

সিঙ্গাপুরে দীর্ঘদিন যাবৎ এ জাতীয় অপারেশন সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করছি। তাঁদের মধ্যে অনেক বাংলাদেশি রোগীও আছেন। তাঁরা এখন বেশ ভালো আছেন। অনেক রোগী আছেন যাঁরা অপারেশনের পর বিয়ে করেছেন, 'আবার সন্তানের পিতামাতা হয়ে সুস্থ জীবনযাপন করছেন। তবে বাংলাদেশের মতো সিঙ্গাপুরে ডোনার পাওয়া একটু কষ্টকর। মৃত ব্যক্তি বা ব্রেইন ডেড রোগীর দেহ থেকে লিভার সংগ্রহ খুবই সহজসাধ্য হলেও আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জীবিত ব্যক্তির দেহ থেকেই লিভার পেয়ে থাকি।' আশার কথা, বাংলাদেশে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট শুরু হয়েছে। প্রত্যাশা থাকবে এখানে রোগীরা বিশ্বমানের সেবা পাবেন। বিশেষজ্ঞ ও সার্জন আছেন।

কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট কেন করতে হয়?

নানা কারণে কিডনি বিকল হয়ে যেতে পারে। এর মধ্যে ধীরগতির কিডনি বিকল রোগে (ক্রনিক কিডনি ফেইলুর) আক্রান্ত হলে রোগীকে শেষ পর্যায়ে এসে শুধু ডায়ালাইলিস করে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু ডায়ালাইসিস একটি জটিল ও ব্যয়বহুল পদ্ধতি। তাই কিডনি প্রতিস্থাপনই এ রোগের স্থায়ী চিকিৎসা।

প্রথম কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট সম্পন্ন হয় কত সালে?

ধীরগতির কিডনি বিকল হওয়া (ক্রমিক কিডনি ফেইলুর) রোগীকে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দিতে বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে প্রথম সফলভাবে কিডনি সংযোজন শুরু হয়।

বর্তমানে কোথায় কোথায় কিডনি সংযোজন করা হচ্ছে?

সরকারিভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি হাসপাতালে সফলভাবে কিডনি সংযোজন করা হয়। এ ছাড়া কিডনি ফাউন্ডেশন, বারডেম হাসপাতাল, ল্যাবএইড, ইউনাইটেড হাসপাতাল ও অ্যাপোলো হাসপাতালসহ বেশ কয়েকটি হাসপাতালে নিয়মিত কিডনি সংযোজন করা হচ্ছে। তবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি হাসপাতাল সম্পূর্ণ সরকারিভাবে পরিচালিত হওয়ায় এখানে কিডনি সংযোজনের ব্যয় সবচেয়ে কম, আনুমানিক ৮০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা। অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোয় এ ব্যয় দুই লাখ টাকা বা তার ওপরে।

কিডনি কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়

দুভাবে সংগ্রহ করা যায়। জীবিত ব্যক্তির দেহ থেকে অথবা মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে। এ ছাড়া ব্রেইন ডেড বা কোমায় থাকা রোগীর দেহ থেকেও কিডনি সংগ্রহ করা যায়। মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে কর্নিয়া নিয়ে যেমন অন্যজনের চোখে আলো ছড়ানো যায় তেমনিভাবে কিডনি সংগ্রহ করেও অন্যকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। তবে আমাদের দেশে মরণোত্তর কিডনি দানের ব্যাপারে এখনো গণসচেতনতা তৈরি হয়নি। যদিও ইতিমধ্যে এ দেশে কিডনি কার্ড চালু হয়েছে। চক্ষুদানের মতো কিডনি দানের জন্যই এই পদ্ধতি। তা ছাড়া ব্রেইন ডেড রোগীর কাছ থেকে কিডনি নেওয়ার বিষয়টি আইনসিদ্ধ নয়, তবে শিগগির আইন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপাতত জীবিত ব্যক্তির দান করা কিডনিই ভরসা।

কারা কিডনি দান করতে পারেন

জীবিত অবস্থায় ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত যে-কেউ কিডনি দান করতে পারেন এবং মৃত্যুর পর যেকোনো বয়সের ব্যক্তি উইল করে কিডনি দান করতে পারেন। কিডনি সংযোজনের পর কিডনি দানকারী এবং কিডনিগ্রহীতা উভয়ই সুস্থ থাকেন ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন। আমাদের শরীরে দুটি কিডনি থাকে। একটি দান করে দিলে স্বাভাবিক কাজকর্মে কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। তবে কিডনিদাতা ও গ্রহীতার রক্ত গ্রুপ থেকে শুরু করে আরো বেশ কয়েকটি বিষয় পরীক্ষা করে মিলিয়ে দেখা হয়। সবকিছু ঠিকঠাক মিলে গেলে তবেই কিডনি দান করা যায়। আমাদের দেশে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাই একমাত্র নিকটাত্মীয় যেমন–মা-বাবা, আপন ভাই-বোন, মামা, খালা, চাচা, ফুফু ও স্বামী-স্ত্রী জীবিতাবস্থায় কিডনি দান করতে পারবেন।

অঙ্গসংযোজন আইন

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবসা বাংলাদেশে একেবারেই নিষিদ্ধ। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন পাস করে। এই আইনে কেউ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবসা করলে সুনির্দিষ্টভাবে শাস্তির বিধান বর্ণিত আছে। মা-বাবা, আপন ভাইবোন, মামা, খালা, চাচা, ফুফু ও স্বামী-স্ত্রী জীবিতাবস্থায় কিডনি দান করতে পারবেন। এর বাইরে কেউ জীবিতাবস্থায় অন্য কোনো আত্মীয়কে কিডনি দান করতে পারবেন না। এ আইনের ব্যত্যয় ঘটলে তিন থেকে সাত বছরের জেল জরিমানা হতে পারে।

ডা. এস এম জি সাকলায়েন
কালের কণ্ঠ ১৮ জুন ২০১০

মেধা লালন প্রকল্প কী এবং কেন?

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত সমাজসেবামূলক প্রকল্পগুলোর অন্যতম হচ্ছে 'মেধা লালন প্রকল্প' (Talent Assistance Scheme সংক্ষেপে TAS)। প্রতিবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় নির্দিষ্ট মান নিয়ে উত্তীর্ণ আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে এই প্রকল্পের অধীনে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া অব্যাহত রাখার নিমিত্তে 'সুদমুক্ত শিক্ষা ঋণ' প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এই ঋণ শিক্ষা সমাপ্তির পর সহজ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। শিক্ষা ঋণ প্রদানের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক অসুবিধার কথা বিবেচনায় রেখে ফাউন্ডেশন থেকে বই-খাতা এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ কেনার জন্য প্রতিবছর অফেরৎযোগ্য কিছু পরিমাণ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্থিক দিক দিয়ে অস্বচ্ছল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে 'সুদমুক্ত ঋণ' হিসেবে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে তাদের আপাত অর্থচিন্তাকে সরিয়ে রেখে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে সহযোগিতা প্রদান এবং তাদের প্রতিভাকে অঙ্কুরেই বিনষ্টের হাত হতে রক্ষা করে পরবর্তীতে সুনাগরিক হিসেবে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের পথ সুগম করা।

এ উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদানের পাশাপাশি ফাউন্ডেশন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে যার প্রভাব তাদের শিক্ষাজীবনে এবং শিক্ষা পরবর্তী কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। ফাউন্ডেশন প্রতিবছরই, সে বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে মেধালালন প্রকল্পের সদস্যপদ লাভের জন্য দরখাস্ত আহবান করে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীরা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পে তাদের সদস্যপদ নিশ্চিত করে। উল্লেখ্য, আবেদনকারী যে বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ঠিক সে বছরই প্রকল্পভুক্তির জন্য আবেদন করবে।

১৯৮৫ সাল থেকে চালু হয়ে এ পর্যন্ত মোট ১৩৫৬ জন ছাত্র-ছাত্রী এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৪১৬ জন ছাত্র-ছাত্রী বর্তমানে শিক্ষাঋণ গ্রহণ করছে। কিছু ড্রপ-আউট বাদে বাকি সদস্যরা তাদের শিক্ষাজীবন সফলভাবে শেষ করে বর্তমানে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে। এদের মধ্যে অনেকেই আজ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত।

লুমিনারির পথচলা

লুমিনারি শব্দের অর্থ 'আলোক উৎস'। এ নামেই একটা সংগঠন আছে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের কিছু শিক্ষার্থী মিলে এ সংগঠনের যাত্রা শুরু করেছিলেন ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। সংগঠনের কাজও নামের সঙ্গে মানানসই। ক্যাম্পাসের আশপাশে গ্রামের যে গরিব ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়, তাদের পড়ালেখায় সাহায্য করেন লুমিনারির সদস্যরা। পুথিগত শিক্ষার বাইরেও যে একটা জানার জগৎ আছে, সুবিধাবঞ্চিত এসব শিশুকে সেই দুনিয়াটার সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিতে চান তাঁরা। তাই লুমিনারির স্লোগান 'আশাই হোক প্রতিটি শিশুর উৎসাহের শক্তি'।

জানা গেল, প্রতি সপ্তাহের শনিবার বিকেলে ক্যাম্পাসেই ছেলেমেয়েদের পড়ানো হয়। খুঁজে বের করা হয় তাদের ভেতরের লুকানো প্রতিভা। লুমিনারির সদস্যসংখ্যা ১৫। আর মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩৪। তাঁদের সবার হাতখরচের টাকা জমিয়েই মূলত এই ছেলেমেয়েদের জন্য বই, খাতা, কলমের ব্যবস্থা করা হয়। বিকেলে দেওয়া হয় নাশতা। আর খুদে শিক্ষার্থীদের নাচ-গান-আবৃত্তির মতো সৃজনশীল কাজে উৎসাহ দিতে নিয়মিতই বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। থাকে পুরস্কারের ব্যবস্থাও।

লুমিনারির পরামর্শক হিসেবে আছেন ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শফিকুল আলম এবং ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আফসানা মৌসুমী।

লুমিনারির সাধারণ সম্পাদক তাজরিন জাহান বলছিলেন, 'প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি আমরা যে ওদের প্রতিভা বিকাশেও সাহায্য করতে পারছি, এই আনন্দটাই সবচেয়ে বড়।' সভাপতি ফরহাদুল ইসলামের বক্তব্য, 'লুমিনারির মাধ্যমে আমরা ওদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করে দিতে চাই।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও এই সংগঠনের কাজে ভীষণ খুশি। ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শফিকুল আলম বলেন, 'লুমিনারি নিয়মিত নানা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মনে আশার আলো জ্বালায়। ভবিষ্যতে বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখায়। আশা করছি সামনেও তারা দারুণ সব উদ্যোগ নিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করবে।'

সাফায়েত হোসেন

প্রথম আলো ০২ অক্টোবর ২০১৬

কারা তরুণদের অনুপ্রেরণা?

‘প্রত্যেকে তাঁর চিন্তা ও চেতনার জায়গা থেকে পছন্দের কাউকে অনুসরণ করে থাকেন। তবে প্রথম রোল মডেল তাঁর পরিবারের কেউ হতে পারেন। বাবা কিংবা মা। তাহলেই একজন মানুষের শুরুটা ভালো হয়।’

তরুণেরাই পরিবর্তন আনেন, যুগে যুগে, কালে কালে। সেই আগুয়ান তরুণদের চেতনার ক্যানভাস রাঙিয়ে দেন যাঁরা, তাঁরাই তো তাঁদের পথপ্রদর্শক! এ প্রসঙ্গে কথা বলা হয়েছে দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে। জানতে চাওয়া হয়েছে কাদের কাজে তাঁরা প্রভাবিত হন, কারা তাঁদের অনুপ্রেরণা।

বেশি শোনা গেছে যে নামগুলো

তরুণদের কথায় যে নামগুলো এসেছে, সেগুলো বৈচিত্র্যময়। যেমন রয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মাদার তেরেসা, নেলসন ম্যান্ডেলা, কাজী নজরুল ইসলাম; তেমনি আছেন ক্রিকেট মাঠের মাশরাফি বিন মুর্তজা থেকে ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ। দুনিয়া কাঁপানো এই ব্যক্তিত্বরা কেন তাঁদের অনুপ্রেরণা, সে কথাও শোনা হলো তাঁদের মুখেই।

কেন তারা অনুপ্রেরণা?

ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজের ছাত্রী মুন্নি আক্তার বলেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা। মুন্নি বলেন, ‘তাঁর মতে, স্পষ্ট ভাষায় মানুষের অধিকারের কথা বলতে আর কাউকে দেখিনি।’ কুমিল্লার ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের একাদশ শ্রেণির সুলগ্না স্নেহা বলে, ‘নেলসন ম্যান্ডেলার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন, সমাজের সব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে আদর্শ তিনি তৈরি করেছেন, তা আমাকে ভীষণভাবে আন্দোলিত করে।’

ফেসবুক পেজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ মিজানুর রহমান মন্তব্য করেছেন, 'সত্যজিৎ রায়কে আমি রোল মডেল ভাবি। তাঁর বানানো সিনেমা, লেখা উপন্যাস যত দেখি বা পড়ি, তত মুগ্ধ হই। তাঁর অসংখ্য গুণের অন্তত একটা গুণ যেন আমি ধারণ করতে পারি।'

রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শাহনেওয়াজ খানের আদর্শ হচ্ছেন মহান বিপ্লবী আর্নেস্তো চে গুয়েভারা। মানুষের কল্যাণ ও সুখের জন্য চের আত্মত্যাগ শাহনেওয়াজকে অনুপ্রাণিত করে। সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সাইদ যেমন ই-কমার্স সাইট আলিবাবার নির্মাতা জ্যাক মাকে রোল মডেল ভাবেন। দিনাজপুর সরকারি কলেজের রেজাউল ইসলামের আদর্শ কাজী নজরুল ইসলাম। 'সবার ওপরে যে মানুষ সত্য, এটাই ছিল নজরুলের সাহিত্য ও জীবন-চেতনার পরম সত্য। তাই তাঁর জীবনাদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠা করাই আমার একান্ত ব্রত।' বেগম রোকেয়া ও শহীদ জননী জাহানারা ইমামের কথা বলেছেন নারায়ণগঞ্জের ইফফাত রহমান। বলেছেন, 'তাঁদের সাহস আমাকে অনুপ্রাণিত করে।'

ক্রীড়াবিদেরাও পিছিয়ে নেই

বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের মিশফাকুর রহমানের আদর্শ সাকিব আল হাসান। বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারের পরিশ্রমী জীবন তাঁকে অনুপ্রেরণা জোগায়। জামালপুরের ডিগ্রিরচর হেফাজ উদ্দিন উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র তৌফিক হাসান বলেছে জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজার কথা। তৌফিকের মতে, 'বারবার ভেঙে পড়ার পরও কীভাবে উঠে দাঁড়াতে হয়, মাশরাফি ভাই সেটা শিখিয়েছেন।' বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের ফরহাদ মৃত্তিকা দেশসেরা সার্ফার হতে চান। তাই তাঁর আদর্শ অদম্য সার্ফার বেথানি হ্যামিলটন। 'দৃঢ়প্রত্যয়ী এই নারীর হাল না ছাড়ার মনোভাব আমাকে দারুণ অনুপ্রাণিত করে।' মৃত্তিকা বলেন।

পরিবারের কেউ হতে পারেন দৃষ্টান্ত

শুধুই যে বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁদের অনুপ্রেরণার উৎস, এমন নয়। গোপালগঞ্জ সরকারি কলেজের শেখ পূরবী যেমন অনুসরণ করেন তাঁর মুক্তিযোদ্ধা বাবা শেখ মিজানুর রহমানের আদর্শ। আবার ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের মেহেরুন মৌরী একক কোনো ব্যক্তি নন, চারপাশের যত ভালো কিছু রয়েছে, তার সবই তিনি গ্রহণ করার চেষ্টা করেন।

এ তো গেল শিক্ষার্থীদের কথা। শোনা যাক একজন শিক্ষকের কথা। সত্যিকার অর্থে কাকে রোল মডেল ভাববেন তরুণেরা। জিজ্ঞেস করেছিলাম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্র্যাকের শিক্ষক ও সংগীতশিল্পী তাহসান রহমান খানকে। তিনি বলেন, 'প্রত্যেকে তাঁর চিন্তা ও চেতনার জায়গা থেকে পছন্দের কাউকে অনুসরণ করে থাকেন। তবে প্রথম রোল মডেল তাঁর পরিবারের কেউ হতে পারেন। বাবা কিংবা মা। তাহলেই একজন মানুষের শুরুটা ভালো হয়।'

■ সজীব মিয়া
কালের কণ্ঠ ২৪ জুলাই ২০১৬

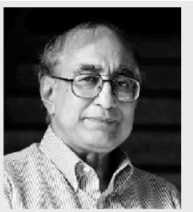

পছন্দের মানুষকে অনুসরণ করি

জামিলুর রেজা চৌধুরী
প্রকৌশলী ও শিক্ষাবিদ

আমরা তো ছেলেবেলা থেকে পরিবার, সমাজ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পছন্দের মানুষকে অনুসরণ করি। তিনি হতে পারেন বাবা, শিক্ষক বা দেশ-বিদেশের বিখ্যাত কেউ। তাই আমার মনে হয়, কোনো একক ব্যক্তি কারও অনুপ্রেরণা হতে পারেন না। একেকজন মানুষের একেক ধরনের ভালো গুণ আমাদের আকৃষ্ট করে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এমনই মনে করি।

আমার বেলায়, একসময় বাবাকে অনুসরণ করেছি, অনেক সময় কোনো প্রিয় শিক্ষককে অনুসরণ করতাম। যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এলাম, এ বিষয়ে খ্যাতিমানদের অনুসরণ করা শুরু করলাম। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যখন একটু অভিজ্ঞতা হলো, তখন চেষ্টা করতাম স্ট্রাকচারাল ডিজাইনে ড. এফ আর খানের মতো যাঁরা বিশ্বে নামকরা, তাঁদের মতো হতে। এভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছি।

তাই তরুণদের বলব, কোনো একক ব্যক্তির জীবনের সবদিক অনুসরণ না করে কয়েকজন মানুষকে অনুসরণ করতে পারো। সবার ভালো গুণাবলির সমষ্টি নিজের পথচলায় কাজে লাগাতে পারো।

শেখ মুজিব, নেলসন ম্যান্ডেলা বা ফিদেল কাস্ত্রো

সেলিনা হোসেন, কথাসাহিত্যিক

ষাটের দশকে আমাদের বেড়ে ওঠার সময়টা ছিল গণজাগরণের। সে সময়ে আমরা অনুসরণ করার মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পেয়েছি। একটি জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আর্থসামাজিক আন্দোলনে সারা জীবন তাঁর যে সোচ্চার অবস্থান, তরুণেরা তা অনুসরণ করতে পারে। আমাদের দেশ ও সংস্কৃতির বাইরের কারও কথা যদি বলি, আমি নেলসন ম্যান্ডেলার কথা বলব। এই বিশ্বনেতা ২৭ বছর জেল খেটেছেন। তবু তিনি হাল ছাড়েননি, মানুষের পক্ষে কাজ করেছেন। তাদের মুক্তির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সফল হয়েছেন। তেমনি কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ত্রোর কথা বলতে পারি। মানুষের পক্ষে থাকার জন্য তিনি ক্ষমতায় থেকেছেন। তাঁর আদর্শের জায়গায়, দর্শনের চিন্তা থেকে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করলেন। এটা একটা বিশাল দিক। তরুণেরা নেতৃত্বের জায়গায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে বঙ্গবন্ধু, নেলসন ম্যান্ডেলা বা ফিদেল কাস্ত্রোর মতো নেতাকে রোল মডেল ভাবা উচিত। তরুণেরা যদি দেশের কথা ভাবে, নিজের অস্তিত্বের কথা ভাবে, নিজের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কথা ভাবে, তাহলে তাদের অবশ্যই নিজস্ব অবস্থানে ফিরে আসতে হবে। ধর্ম পবিত্র বিশ্বাস। ধর্ম কখনো বলেনি মানুষ হত্যা করে নিজের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করার কিংবা নিজের দর্শনকে আলোকিত করার কথা।

জীবনে যা সবারই শেখা উচিত

১. অন্যের মতামত : অধিকাংশ মানুষই অন্যের মতামত ও সমালোচনা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারে না। এটুকু সহনশীলতা সবারই চর্চা করা উচিত। অনেক জটিলতা এর থেকেও এড়ানো সম্ভব।

২. দুঃখ প্রকাশ : ভুল হলে অন্যের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে তা স্বীকার করে নেওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে, মানুষ মাত্রই ভুল করতে পারে। এটি অস্বাভাবিক নয়। ভুলের জন্য দ্রুত দুঃখ প্রকাশ করতে শিখুন।

৩. বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সময় ব্যয় : সময় একবার চলে গেলে তা আর ফিরে আসে না। এ কারণে সময় ব্যয়ে বিচক্ষণ হওয়ার বিষয়টি শেখা উচিত ।

৪. 'না' বলা : কোনো কাজে অপারগ হলে সে জন্য 'না' বলে দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু 'না' বলা অনেকের জন্যই খুব কঠিন কাজ। এ কারণেই 'না' বলা শিখতে হবে।

৫. সহমর্মিতা : অন্যের দুঃখ-দুর্দশায় সহমর্মিতা প্রকাশ আপনাকে তার কাছাকাছি নিয়ে যাবে। এটি মানুষের সামাজিক হয়ে ওঠার অন্যতম উপায়। তাই অন্যের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশের উপায়ও শিখে নিতে হবে।

৬. শরীরের ভাষা : শুধু মুখের ভাষাই নয়, আপনার দাঁড়ানোর ভঙ্গি, মুখভঙ্গিমা, হাতের নড়াচড়া ইত্যাদি আপনার সম্পর্কে অন্যের ধারণা তৈরিতে সহায়ক হবে। তাই কিভাবে শরীরের ভাষায় নিজেকে ভালোভাবে প্রকাশ করতে হবে, তা জেনে নিন।

৭. বন্ধু তৈরি : যেকোনো পরিবেশেই আপনার আশপাশের মানুষদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে আপনার শিখে নিতে হবে কীভাবে তাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াবেন, তার কিছু কৌশল।

৮. একাধিক ভাষা : শুধু আপনার মাতৃভাষা শেখার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই। একটু কষ্ট করে একাধিক ভাষা শিখে নিন। এটি আপনাকে যেমন স্মার্ট হিসেবে পরিচিত করবে তেমনি আপনার দক্ষতাও বহুগুণ বৃদ্ধি করবে।

৯. বাজেট অনুযায়ী চলুন : ব্যক্তিগত আর্থিক বিষয়গুলো নিয়ে একটি বাজেট তৈরি করুন। এরপর সে বাজেট অনুযায়ী জীবনধারণ করা শিখে নিন। এতে আপনার আর্থিক স্বস্তি আসবে।

১০. বক্তব্য : জনসমক্ষে বক্তব্য প্রদান করতে গেলে অনেকেই বিব্রতবোধ করেন। যদিও একটু অনুশীলনেই তা শিখে নেওয়া যায়। সঠিকভাবে বক্তব্য প্রদান শিখতে পারলে তা আপনাকে জীবনে অনেকদূর এগিয়ে নেবে।

ওমর শরীফ পলুব
বিজনেস ইনসাইডার অবলম্বনে
কালের কণ্ঠ ২৫ এপ্রিল ২০১৬

বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ সঙ্গে ভাতা ও চাকরি

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আপনাকে ভাতাও দেওয়া হবে। বিষয়টি ব্যবস্থাপনা করছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)।

কেন এই প্রশিক্ষণ, কী উদ্দেশ্য?

বেসিস মনে করে, দক্ষ মানবসম্পদ গড়তে না পারলে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব। দক্ষ জনশক্তি থাকলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সহজেই আকৃষ্ট হন। তথ্যপ্রযুক্তিতে মানবসম্পদ তৈরিতে ২০০৭ সালে বেসিস প্রথম প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে। ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরি করতে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেই থেকে বেসিসের প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিআইটিএমের মাধ্যমে প্রায় আট হাজার ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যার প্রায় ৮০ শতাংশ ইন্ডাস্ট্রিতে বা বাকিরা ব্যক্তিগতভাবে কাজ করছেন।

দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে গুরুত্ব দিয়ে 'ওয়ান বাংলাদেশ' রূপকল্প ঘোষণা দেয় বেসিস। এই রূপকল্পের অন্যতম বিষয় হচ্ছে ১০ লাখ দক্ষ জনশক্তি তৈরি। এ লক্ষ্য অর্জনে আগামী তিন বছরে বিনামূল্যে ২৩ হাজার দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে বেসিস। জনশক্তি তৈরির এই কাজকে এগিয়ে নিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের (এসইআইপি) একটি অংশ বাস্তবায়ন করছে বেসিস। যার অর্থায়নে রয়েছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) ও সুইস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (এসডিসি)। বেসিসের বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের ব্যয় প্রায় ৪৬ কোটি টাকা।

প্রশিক্ষণ পাবেন মোট কত জন? কোন পর্যায়ে কত জন করেন?

তিন বছরে মোট ২৩ হাজার জন প্রশিক্ষণ পাবেন। প্রকল্পের প্রথম বছর শুধু ঢাকা বিভাগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরে পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রাম,

তিন বছরে মোট ২৩ হাজার জন প্রশিক্ষণ পাবেন। প্রকল্পের প্রথম বছর শুধু ঢাকা বিভাগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরে পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, খুলনাসহ অন্যান্য বিভাগে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলবে। এই প্রকল্পের আওতায় বিআইটিএম প্রথম বছরে পাঁচ হাজার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে নয় হাজার করে শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেবে।

রাজশাহী, বরিশাল, খুলনাসহ অন্যান্য বিভাগে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলবে। এই প্রকল্পের আওতায় বিআইটিএম প্রথম বছরে পাঁচ হাজার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে নয় হাজার করে শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেবে।

কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মেয়াদ কত দিন করে?

মোট ১৪টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্র্যাকটিক্যাল সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও), ডিজিটাল মার্কেটিং, আইটি সাপোর্ট টেকনিক্যাল, কাস্টমার সাপোর্ট অ্যান্ড সার্ভিস ও আইটি সেলস বিষয়ে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ ছাড়া ওয়েব ডিজাইন, গ্রাফিক ডিজাইন, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট, পিএইচপি, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট-ডটনেট, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট, সার্ভার ম্যানেজমেন্ট ও ক্লাউড ম্যানেজমেন্ট, অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং, ইংলিশ কমিউনিকেশন ও বিজনেস কমিউনিকেশন বিষয়ে তিন মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা ক্লাস নেওয়া হয়।

কবে থেকে শুরু

গত বছরের ১ এপ্রিল থেকে বিডিবিএল ভবনে অবস্থিত বিআইটিএম ল্যাবে এসইআইপি প্রকল্পের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ইতিমধ্যে তিন হাজার জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যেকোনো সময় আবেদন করা যায়। তবে প্রশিক্ষণ দল হিসেবে দেওয়া হয় বলে প্রশিক্ষণার্থীদের চূড়ান্ত পর্বে যেতে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়।

ভাতা কী হারে দেওয়া হবে? একজন কত টাকা এবং কীভাবে পাবে?

কোনো প্রশিক্ষণ ফি ছাড়াই প্রশিক্ষণ নেওয়া যাবে। এ ছাড়া প্রশিক্ষণের জন্য মাসিক ৩ হাজার ১৫০ টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে প্রশিক্ষণার্থীদের। এ ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হবে।

অন্য কোনো ধরনের খরচ লাগবে কি না?

প্রশিক্ষণ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে, পাশাপাশি ভাতাও দেওয়া হচ্ছে। তাই শিক্ষার্থীকে কোনো টাকাই খরচ করতে হবে না।

আবেদনের নিয়ম

স্নাতক শেষ অথবা শেষের পর্যায়ে এমন যে কেউই এসইআইপি প্রকল্পে প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে এ জন্য তাঁকে কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক ধাপ অতিক্রম করতে হবে। প্রথমে তাঁকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে অনলাইনে (http://bitm.org.bd/seip) আবেদন করতে হবে। আগ্রহীরা একটি বিষয়কে প্রধান করে মোট তিনটি বিষয়ে আবেদন করতে পারবেন। এরপর লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে। লিখিত পরীক্ষার ২ থেকে ৩ দিন আগেই তাঁদের পরীক্ষার সময়, দিন ও স্থান জানানো হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। নির্দিষ্ট বিষয়ের মৌলিক ধারণা পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষকেরা মৌখিক পরীক্ষা নেন। যাঁরা মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাঁরাই পরবর্তীকালে ভর্তি হয়ে ক্লাস করার সুযোগ পাবেন। প্রশিক্ষণ শেষে সনদ ও কর্মসংস্থানে সহায়তা দেবে বেসিস-বিআইটিএম। যোগ্যতা অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত বেসিসের সদস্যভুক্ত কোম্পানিগুলোতে পাঠানো হবে। এ ছাড়া চাকরি খোঁজার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে, যেখানে বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে প্রশিক্ষণার্থীরা সরাসরি সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাবেন।

যোগাযোগ

এই কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য (http://bitm.org.bd/seip) সাইটে গিয়ে নিবন্ধন করতে হবে। এ ছাড়া বিস্তারিত জানার জন্য রাজধানীর কারওয়ান বাজারের বিডিবিএল ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত বিআইটিএম অফিসে গিয়ে সরাসরি জানা যাবে। ০৯৬১২৩৪২৪৮৬ নম্বরে ফোন করে যোগাযোগ করা যাবে। চাইলে আপনিও নিতে পারেন এই সুযোগ।

মিন্টু হোসেন
প্রথম আলো ১৮ মার্চ ২০১৬

নির্ভুল জীবনবৃত্তান্ত লেখার ছয় পরামর্শ

চাকরির বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ বিভাগে হাজারো সিভি জমা পড়ে। বহু প্রতিষ্ঠান ই-মেইলে সিভি আহ্বান করছে। এসব ই-মেইলের ভিড়ে আপনার সিভিটি যাতে কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ে, তা নিশ্চিত করা জরুরি। কখনো কম্পিউটারের স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন হয়। তাই ই-মেইলটি পাঠানোর আগে সতর্ক হোন। কারণ, ছোটখাটো ভুলের কারণেও আপনার সিভিটি বাদ পড়তে পারে। এসব ভুল এড়ানোর জন্য ছয়টি পরামর্শ অনুসরণ করতে পারেন:

প্রাসঙ্গিক শব্দচয়ন

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট পদের বর্ণনায় যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলো আপনার সিভিতেও রাখতে হবে। তাহলে কম্পিউটার সেগুলো চিনতে পারবে এবং আপনার সিভিটি আগে বাছাই করে নেবে। আর বাছাইয়ের কাজটি ব্যক্তি মানুষ করলেও উপযুক্ত শব্দচয়নের কারণে একই সুবিধা পাবেন আপনি। ফলে লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউতে আপনার আমন্ত্রণ পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে।

পরিচয়ের সুবিধা

যেখানে আবেদন করছেন, সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আগে থেকে আপনার যোগাযোগ থাকলে, সেই সুবিধা কাজে লাগাতে পারেন। তাহলে আপনার সিভিটি নিশ্চিতভাবে কর্তৃপক্ষের নজরে পড়বে। মানবসম্পদ বিভাগের শীর্ষস্থানীয় কারও ই-মেইল ঠিকানায় সিভির একটি কপি পাঠিয়ে ইন্টারভিউর সুযোগ চেয়ে তাঁকে অনুরোধ করে লিখতে পারেন। অথবা অন্য কোনো বিভাগে আপনার পরিচিত কেউ থাকলে তাঁকে জানিয়ে রাখুন, আপনি ওই প্রতিষ্ঠানে যে পদের জন্য আবেদন করেছেন। তিনি যদি আপনাকে একজন প্রার্থী হিসেবে সুপারিশ করে সিভিটি কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেন অথবা জানিয়ে দিতে পারেন, আপনার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যাবে।

সংক্ষেপে লিখুন

অযথা দীর্ঘ না করে যতটুকু সম্ভব সংক্ষেপে নিজের সিভি তৈরি করুন। অবশ্যই সঠিক ও প্রয়োজনীয় তথ্য দেবেন। সিভিতে গ্রাফিকস, লোগো ও অন্যান্য অলঙ্করণ না করাই ভালো। কারণ, এসবের কারণে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় আপনার সিভিটি কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে।

উদ্যোগী প্রয়াস

চাকরিপ্রার্থীর মধ্যে উদ্যোক্তাসুলভ চেষ্টা থাকা জরুরি। কারণ, এইচআরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বা তদবিরও অনেক সময় বিফল হতে পারে। বরং নিজের বাড়তি যোগ্যতা ও আকর্ষণীয় দিকগুলো লিখে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের কারও বরাবর চিঠি বা ই-মেইল পাঠিয়ে এবং অনুমতি নিয়ে ফোন করে যোগাযোগ করে সুফল পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তা ছাড়া এইচআরকে এ ব্যাপারে বারবার বিরক্ত করাটা নিশ্চয়ই ইতিবাচক কিছু নয়।

কাউকে দেখিয়ে নিন

সিভি পাঠানোর আগে অন্য কাউকে দেখিয়ে নিলে ভুলভ্রান্তি এড়ানো যায়। ছোটখাটো ভুলগুলো অনেক সময় নিজের নজর এড়িয়ে যায়, কিন্তু দ্বিতীয় কারও চোখে সেটা নিশ্চয়ই পড়বে। তাই পর্যালোচনার জন্য কমপক্ষে একজনকে পড়ানোর পরই সিভিটি পাঠানোর জন্য চূড়ান্ত করতে হবে।

নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা

বড় প্রতিষ্ঠানগুলো কাঙ্ক্ষিত কর্মীর মধ্যে সৃজনশীলতা দেখতে চায়। তাই সিভি পাঠানোর আগে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পর্কে জেনে নেওয়া ভালো। এতে আপনি সঠিক প্রস্তুতি নিয়ে সিভি তৈরি করতে পারবেন, অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল এড়ানোও সম্ভব হবে। যেকোনো নিয়োগদাতা প্রথমেই আপনার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা জানতে চাইবে। তাই এসব তথ্য আপনার সিভিতে যেন সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় থাকে।

আশিস আচার্য

প্রথম আলো ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫

সূত্র: ফোর্বস

প্রকল্প সংবাদ

সুদমুক্ত শিক্ষাঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছেন যারা

মেধা লালন প্রকল্প'র প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকে ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়া শুরু করেছেন, এবং অনেকে ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করেছেন। ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে যারা সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করেছেন তাঁদের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো :

ক্রমিক নং	নাম ও সদস্য নম্বর	ক্রমিক নং	নাম ও সদস্য নম্বর
১.	আবুল হাসান মুহম্মদ বাশার (সদস্য নং ০১/১৯৮৫)	২৫.	মো. আব্দুল হামিদ (সদস্য নং ৫০/১৯৮৭)
২.	মো. শাহ এমরান (সদস্য নং ০২/১৯৮৫)	২৬.	মো. জাহাঙ্গীর আলম (সদস্য নং ৫১/১৯৮৭)
৩.	মো. আবু ছায়েদ (সদস্য নং ০৩/১৯৮৫)	২৭.	মো. আমিনুল ইসলাম (সদস্য নং ৫২/১৯৮৭)
৪.	মো. আবুল ইসলাম (সদস্য নং ০৪/১৯৮৫)	২৮.	আহমেদ মেহেদী ইমাম (সদস্য নং ৫৩/১৯৮৭
৫.	মো. কালাম হোসেন চৌধুরী (সদস্য নং ০৬/১৯৮৫)	২৯.	মো. তাজুল ইসলাম (সদস্য নং ৫৬/১৯৮৭)
৬.	এ. কে. এম. মেজবাহ উদ্দিন (সদস্য নং ০৮/১৯৮৫)	৩০.	আজিজুন্নেসা (সদস্য নং ৫৯/১৯৮৭)
৭.	জি. এম. আজিজুর রহমান (সদস্য নং ০৯/১৯৮৫)	৩১.	মাহবুবা সুলতানা (সদস্য নং ৬১/১৯৮৭)
৮.	শাকিল ওয়াহেদ (সদস্য নং ১০/১৯৮৫)	৩২.	সৈয়দা জারকা জহির (সদস্য নং ৬৩/১৯৮৭)
৯.	সারওয়াত চৌধুরী (সদস্য নং ১৫/১৯৮৫)	৩৩.	আফরিন সুলতানা (সদস্য নং ৬৪/১৯৮৭)
১০.	মো. আব্দুল খালেক (সদস্য নং ১৭/১৯৮৫)	৩৪.	আফরোজা আক্তার (সদস্য নং ৬৫/১৯৮৮)
১১.	ধরিত্রী কুমার সরকার (সদস্য নং ১৮/১৯৮৫)	৩৫.	শামীম আরা বেগম (সদস্য নং ৬৭/১৯৮৮)
১২.	সালেহ মো. মাসুদ (সদস্য নং ১৯/১৯৮৫)	৩৬.	মো. হেদায়েত উল্লাহ (সদস্য নং ৬৮/১৯৮৮)
১৩.	শেখ মু. রেফাত আলী (সদস্য নং ২১/১৯৮৫)	৩৭.	মো. মনিরুল ইসলাম (সদস্য নং ৭১/১৯৮৮)
১৪.	মো. আব্দুল হালিম (সদস্য নং ২৩/১৯৮৬)	৩৮.	দিলরুবা খানম (সদস্য নং ৭৫/১৯৮৮)
১৫.	এফ. এম. ইসহাক আলী (সদস্য নং ২৬/১৯৮৬)	৩৯.	মো. ইকবাল আহমেদ মজুমদার (সদস্য নং ৭৬/১৯৮৮)
১৬.	ইমতিয়াজ আহমেদ মজুমদার (সদস্য নং ৩২/১৯৮৬)	৪০.	অসিত মজুমদার (সদস্য নং ৭৭/১৯৮৮)
১৭.	মো. কামরুল আহসান (সদস্য নং ৩৩/১৯৮৬)	৪১.	মো. মাহবুবুর রহমান (সদস্য নং ৭৯/১৯৮৮)
১৮.	তাপস কুমার কয়াল (সদস্য নং ৩৫/১৯৯৬)	৪২.	দেওয়ান মাউদুদুর রহমান (সদস্য নং ৮০/১৯৮৮)
১৯.	শামসুন্নাহার (সদস্য নং ৩৬/১৯৮৬)	৪৩.	মুহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান (সদস্য নং ৮২/১৯৮৮)
২০.	অহেদা হাশমত (সদস্য নং ৩৮/১৯৮৬)	৪৪.	শায়লা ওয়াদুদ (সদস্য নং ৮৬/১৯৮৮)
২১.	শিরীন বানু (সদস্য নং ৩৯/১৯৮৬)	৪৫.	ফারুক আহমেদ (সদস্য নং ৮৭/১৯৮৯)
২২.	আয়েশা খাতুন (সদস্য নং ৪০/১৯৮৬)	৪৬.	মো. শাহাদৎ হোসেন (সদস্য নং ৯১/১৯৮৯)
২৩.	মো. আব্দুল আজিজ (সদস্য নং ৪৩/১৯৮৬)	৪৭.	শহীদুল ইসলাম (সদস্য নং ৯৫/১৯৮৯)
২৪.	এস. এম. আব্দুল করিম (সদস্য নং ৪৯/১৯৮৭)	৪৮.	মো. কামরুজ্জামান (সদস্য নং ৯৬/১৯৮৯)

ক্রমিক নং	নাম ও সদস্য নম্বর	ক্রমিক নং	নাম ও সদস্য নম্বর
৪৯.	নুরুন্নাহার মিনা (সদস্য নং ৯৮/১৯৮৯)	৮৩.	ইলোরা নাহিদ (সদস্য নং ২৩৬/১৯৯৬)
৫০.	তপন কুমার পাল (সদস্য নং ১০১/১৯৮৯)	৮৪.	মোছা. সুলতানা রাজিয়া (সদস্য নং ২৩৯/১৯৯৬)
৫১.	মো. আতাউর রহমান (সদস্য নং ১০৩/১৯৮৯)	৮৫.	মু. জামাল উদ্দীন (সদস্য নং ২৪০/১৯৯৬)
৫২.	মো. তৌহিদ-উর-রহমান (সদস্য নং ১০৬/১৯৮৯)	৮৬.	নুসরাত জাহান (সদস্য নং ২৪১/১৯৯৬)
৫৩.	খায়রুল আলম (সদস্য নং ১১০/১৯৯০)	৮৭.	ফুয়াদ আশরাফুল আবেদীন (সদস্য নং ২৪৪/১৯৯৭)
৫৪.	এ.বি.এম. খালেকুজ্জামান (সদস্য নং ১১৯/১৯৯০)	৮৮.	দিলরুবা আক্তার (সদস্য নং ২৪৫/১৯৯৭)
৫৫.	আমেনা বেগম মিমি (সদস্য নং ১২১/১৯৯০)	৮৯.	মো. একরামুজ্জামান (সদস্য নং ২৪৬/১৯৯৭)
৫৬.	আজমিয়ারা পারভীন (সদস্য নং ১২৩/১৯৯০)	৯০.	মনিরা বেগম (সদস্য নং ২৪৯/১৯৯৭)
৫৭.	মোহাম্মদ একরাম উল্লাহ (সদস্য নং ১৩০/১৯৯০)	৯১.	শ্যামলী রানী দে (সদস্য নং ২৫২/১৯৯৭)
৫৮.	গুলনাহার বেগম (সদস্য নং ১৩৫/১৯৯১)	৯২.	জান্নাতুল ফেরদৌস (সদস্য নং ২৫৩/১৯৯৭)
৫৯.	প্রতিমা রানী কর্মকার (সদস্য নং ১৪১/১৯৯১)	৯৩.	মো. মোজাম্মেল হক (সদস্য নং ২৫৫/১৯৯৭)
৬০.	মো. জালাল আকবরী খান (সদস্য নং ১৪৩/৯১)	৯৪.	মো. আসাদুল ইসলাম (সদস্য নং ২৫৬/১৯৯৭)
৬১.	মোসা. মেহেরন্নেছা (সদস্য নং ১৪৫/১৯৯১)	৯৫.	মো. আশিকুল ইসলাম (সদস্য নং ২৫৭/১৯৯৭)
৬২.	মো. সাইদুর রহমান (সদস্য নং ১৫১/১৯৯১)	৯৬.	মো. সাইফুল ইসলাম (সদস্য নং ২৫৮/১৯৯৭)
৬৩.	মোহাম্মদ আলী (সদস্য নং ১৫৪/১৯৯৩)	৯৭.	কান্তি ভুষণ মজুমদার (সদস্য নং ২৬০/১৯৯৭)
৬৪.	আবু হাশেম (সদস্য নং ১৫৮/১৯৯৩)	৯৮.	মো. আলী আজম মিয়া (সদস্য নং ২৬১/১৯৯৭)
৬৫.	মো. শফিকুল ইসলাম (সদস্য নং ১৬৩/১৯৯৩)	৯৯.	মো. আব্দুল মোতালিব (সদস্য নং ২৬৩/১৯৯৭)
৬৬.	মো. লিহাজ উদ্দিন (সদস্য নং ১৬৫/১৯৯৩)	১০০.	সমীরন কান্তি নাথ (সদস্য নং ২৬৫/১৯৯৭)
৬৭.	সোহেল পারভেজ (সদস্য নং ১৬৯/১৯৯৩)	১০১.	অলোক কুমার পাল (সদস্য নং ২৬৬/১৯৯৭)
৬৮.	মো. আব্দুল ওয়াদুদ (সদস্য নং ১৭৩/১৯৯৩)	১০২.	ফারজানা তানজিন রুমা (সদস্য নং ২৬৮/১৯৯৭)
৬৯.	মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন (সদস্য নং ১৭৫/১৯৯৪)	১০৩.	মো. মাহতাবুল ইসলাম (সদস্য নং ২৭৫/১৯৯৮)
৭০.	মো. খোরশেদ আলম (সদস্য নং ১৭৭/১৯৯৪)	১০৪.	মো. সাইফুল ইসলাম (সদস্য নং ২৭৯/১৯৯৮)
৭১.	মো. মনসুর আলী (সদস্য নং ১৭৯/১৯৯৪)	১০৫.	এস. এম. মাহফুজুর রহমান (সদস্য নং ২৮৩/১৯৯৮)
৭২.	মিন্টু বৈরাগী (সদস্য নং ১৮২/১৯৯৪)	১০৬.	মোছা. নীহার আফরোজ শাপলা (সদস্য নং ২৮৪/১৯৯৮)
৭৩.	তুষার কান্তি দাস (সদস্য নং ১৮৪/১৯৯৪)	১০৭.	মো. হাসমত আলী (সদস্য নং ২৮৮/১৯৯৮)
৭৪.	জবা রানী দেবী (সদস্য নং ১৮৫/১৯৯৪)	১০৮.	নিবেদিতা রায় (সদস্য নং ৩০০/১৯৯৮)
৭৫.	লাকি ফারহানা (সদস্য নং ১৮৬/১৯৯৪)	১০৯.	মোহাম্মদ আবু সাঈদ আরফিন খাঁন (৩০৮/১৯৯৯)
৭৬.	মো. সাফায়েত উল্লাহ (সদস্য নং ১৯৬/১৯৯৪)	১১০.	মো. কুতুব উদ্দিন খান (সদস্য নং ৩০৯/১৯৯৯)
৭৭.	অমর কুমার বর (সদস্য নং ২০২/১৯৯৫)	১১১.	মো. রহিম মিয়া (সদস্য নং ৩১৭/১৯৯৯)
৭৮.	শামসুন্নাহার সালমা (সদস্য নং ২১৬/১৯৯৫)	১১২.	মো. এমরান হোসেন (সদস্য নং ৩১৯/১৯৯৯)
৭৯.	অসীম কুমার সরকার (সদস্য নং ২১৭/১৯৯৫)	১১৩.	মো. তরিকুল ইসলাম (সদস্য নং ৩২৩/১৯৯৯)
৮০.	এ. এম. জামাল হোসেন (সদস্য নং ২২৬/১৯৯৬)	১১৪.	এস. জি. এম. তারিক-বিন-আলী (সদস্য নং ৩২৭/১৯৯৯)
৮১.	মোহাম্মদ মোজাহারুল ইসলাম (সদস্য নং ২২৮/১৯৯৬)	১১৫.	আবু সালেহ মো. কামরুজ্জামান (সদস্য নং ৩২৮/১৯৯৯)
৮২.	সানী খান মজলিস (সদস্য নং ২৩৫/১৯৯৬)	১১৬.	মো. হারুন অর রশিদ (সদস্য নং ৩২৯/১৯৯৯)

ক্রমিক নং	নাম ও সদস্য নম্বর	ক্রমিক নং	নাম ও সদস্য নম্বর
১১৭.	মোছা. সায়লা পারভীন (সদস্য নং ৩৩৪/১৯৯৯)	১৪১.	শাকিলা-বু-পাশা (সদস্য নং ৫০৫/২০০২)
১১৮.	লায়লা আফিফা আজাদ (সদস্য নং ৩৪০/১৯৯৯)	১৪২.	শামিমা আক্তার শাপলা (সদস্য নং ৫২৪/২০০৩)
১১৯.	আছিয়া আক্তার (সদস্য নং ৩৪১/১৯৯৯)	১৪৩.	ফাতেমা জেনী (সদস্য নং ৫৪১/২০০৩)
১২০.	টুম্পা বড়ুয়া (সদস্য নং ৩৪৩/১৯৯৯)	১৪৪.	মো. মোস্তফা কামাল (সদস্য নং ৫৬২/২০০৩)
১২১.	তাছলিমা আক্তার (সদস্য নং ৩৪৭/১৯৯৯)	১৪৫.	মিঠু চন্দ্র অধিকারী (সদস্য নং ৫৬৬/২০০৩)
১২২.	ফারেহা শিরিন চৌধুরী (সদস্য নং ৩৫১/১৯৯৯)	১৪৬.	দিলীপ কুমার ত্রিপুরা (সদস্য নং ৫৭২/২০০৩)
১২৩.	মো. তফাজ্জাল হোসেন (সদস্য নং ৩৫৬/২০০০)	১৪৭.	মো. আশরাফ সিদ্দিক (সদস্য নং ৫৭৫/২০০৩)
১২৪.	এস. কে. এম. রাকিবুজ্জামান (সদস্য নং ৩৫৭/২০০০)	১৪৮.	মো. শামীম কবীর সরকার (সদস্য নং ৫৭৮/২০০৩)
১২৫.	মো. আবুল খায়ের (সদস্য নং ৩৬০/২০০০)	১৪৯.	উম্মে হানি (সদস্য নং ৬০৫/২০০৪)
১২৬.	মো. হাসানুজ্জামান (সদস্য নং ৩৬৩/২০০০)	১৫০.	মোহাম্মদ নুরুল হাসান (সদস্য নং ৬১১/২০০৪)
১২৭.	মো. আরমান উল্লাহ (সদস্য নং ৩৬৬/২০০০)	১৫১.	নূরী জাহান আরবী (সদস্য নং ৬৫৮/২০০৫ এসএসসি)
১২৮.	মোহাম্মাদ (সদস্য নং ৩৯১/২০০০)	১৫২.	নার্গিস সুলতানা (সদস্য নং ৭০৮/২০০৭ এসএসসি)
১২৯.	খাইরুল আলম (সদস্য নং ৩৯৪/২০০০)	১৫৩.	মাকসুদা জাহান আঁখি (সদস্য নং ০১/২০০৫ এইচএসসি)
১৩০.	মোছা. নূর-এ-জান্নাত (সদস্য নং ৪০৪/২০০০)	১৫৪.	মোহাম্মদ খুরশেদ আলম (সদস্য নং ০২/২০০৫ এইচএসসি)
১৩১.	তানজিয়া আক্তার (সদস্য নং ৪১৩/২০০০)	১৫৫.	কাউকাব আকতার (সদস্য নং ০৯/২০০৫ এইচএসসি)
১৩২.	মো. আরাফাত হোসেন (সদস্য নং ৪২৩/২০০১)	১৫৬.	ফারজানা ইসলাম খান (সদস্য নং ১১/২০০৫ এইচএসসি)
১৩৩.	মো. মোস্তফা মাহবুব রাসেল (সদস্য নং ৪২৬/২০০১)	১৫৭.	আতাউর রহমান (সদস্য নং ১৯/২০০৫ এইচএসসি)
১৩৪.	সোহেলুর রহমান (সদস্য নং ৪৪১/২০০১)	১৫৮.	মো. আমিরুল ইসলাম (সদস্য নং ২৩/২০০৫ এইচএসসি)
১৩৫.	সুশোভন রায় শুভ্র (সদস্য নং ৪৫৩/২০০১)	১৫৯.	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান আকন্দ (সদস্য নং ২৬/২০০৫ এইচএসসি)
১৩৬.	মো. শাহজাহান কবীর (সদস্য নং ৪৮১/২০০২)	১৬০.	নাদিরা মোকাররোমা (সদস্য নং ৩৪/২০০৬ এইচএসসি)
১৩৭.	মো. মিজানুর রহমান (সদস্য নং ৪৮২/২০০২)	১৬১.	খালেদা ইয়াসমিন (সদস্য নং ৬৭/২০০৭ এইচএসসি)
১৩৮.	জওহর বালা (সদস্য নং ৪৯২/২০০২)	১৬২.	ফারজানা ববি (সদস্য নং ৭৪৬/২০০৮)
১৩৯.	রূপন কান্তি নাথ (সদস্য নং ৪৯৪/২০০২)	১৬৩.	মো. সালাহউদ্দিন (সদস্য নং ৭৭০/২০০৮)
১৪০.	মোছা. নাসরিন জাহান (সদস্য নং ৪৯৬/২০০২)		

আমরা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাদের এই দায়িত্ব সচেতনতার পরিচয় প্রদানের ফলেই মেধালালন প্রকল্প'র কার্যক্রমের আওতায় আরও অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে ঋণ প্রদান সম্ভবপর হচ্ছে। নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যারা এখনো ঋণ ফেরত প্রদান শুরু করেননি, তাদের অতিসত্বর কিস্তিতে/এককালীন ঋণ ফেরত প্রদান করবার জন্য আন্তরিক অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

ফাউন্ডেশন সংবাদ

শোক

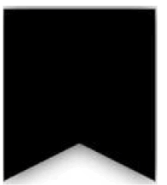

ফাউন্ডেশনের জেনারেল বডি'র সম্মানিত প্রাক্তন সদস্য বিশিষ্ট সমাজসেবক মুকাদ্দেসা এ. কাসেম বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে গত ২৬ জুন, ২০১৭ ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি, বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংগঠনের সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ২০০৬ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বডির একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশেষ করে 'মেধা লালন প্রকল্প' এর অন্তর্ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং নিয়মিত তাদের পড়ালেখার অগ্রগতির বিষয়ে খোঁজখবর নিতেন। ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রায় তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে ভূমিকা রেখে গেছেন তা আমরা সবসময় কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবো। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

অভিনন্দন!

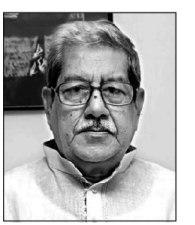

ফাউন্ডেশনের জেনারেল বডি'র সম্মানিত সদস্য; প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, লেখক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরেটাস প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান সম্প্রতি ভারতের কলকাতা থেকে প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকা প্রদত্ত 'আনন্দ পুরস্কার ১৪২৩'-এ ভূষিত হয়েছেন। তাঁর রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'বিপুলা পৃথিবী'-র জন্য তাঁকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। তিনি দ্বিতীয়বারের মতো এই সম্মাননা পেলেন। 'ঐতিহ্যের অঙ্গীকার' শিরোনামে বাংলা কবিতা, গান ও নাটক সম্বলিত ১৪ সিরিজের ক্যাসেটের জন্য ১৯৯৪ সালে তিনি প্রথমবার এই পুরস্কার লাভ করেছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯৫৮ সাল থেকে এই পুরস্কার প্রদান করে আসছে। তাঁর এই অর্জনে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন!! আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

বিজ্ঞপ্তি

মেধা লালন প্রকল্প'র সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম অফিসার ও 'নবীন' এর সহকারী সম্পাদক রওনক আশরাফী স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে দেশের বাইরে চলে যাবার জন্যে সম্প্রতি চাকুরি থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন, যা ১ জুলাই, ২০১৭ থেকে কার্যকর হতে যাচ্ছে। আগামী সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭) থেকে 'নবীন' এর সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন প্রোগ্রাম অফিসার জনাব মো. শাহরিয়ার পারভেজ। রওনক আশরাফী মেধা লালন প্রকল্পের যেসব ব্যাচের কার্যক্রম তদারক করতেন তা আগামীতে প্রোগ্রাম অফিসার নাসিমা সুলতানা, এবং প্রোগ্রাম অফিসার মো. শাহরিয়ার পারভেজ তদারক করবেন। সেসব ব্যাচের সদস্যদের নিম্নোক্ত বিন্যাস অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অফিসার বরাবর চিঠি/প্রতিবেদন পাঠানো এবং ফোনে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। আমরা রওনক আশরাফী'র সুস্বাস্থ্য এবং সফলতা কামনা করছি।

ব্যাচ নং	দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার
২০০৩, ২০০৫ (এইচএসসি), ২০০৬ (এইচএসসি), ২০১৫	মো. শাহরিয়ার পারভেজ, প্রোগ্রাম অফিসার
২০০৯, ২০১১, ২০১২	নাসিমা সুলতানা, প্রোগ্রাম অফিসার

টিকেট চেকার

বিকাশ কুমার কর্মকার
সদস্য নং ৭৯/২০০৭

ভদ্রলোক জিরাফের মতো লম্বা গলাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে আমার আপাদমস্তক দেখলেন, তারপর ধপ করে ঘাড়টা চেপে ধরলেন। 'তোর টাকা দেওয়া লাগবে না। অফিসে চল, তিন দিন জেলে থাক। টিকেট না কেটে বড় বড় কথা বলার মজা বুঝবি।' বলে আমাকে হিড়হিড় করে টেনে স্টেশনমাস্টারের রুমে নিয়ে গেলেন। প্রচণ্ড অপমানে আমার পুরো শরীর রি রি করে উঠল।

ভুলটা আমারই, বাসা থেকে বের হয়েই যখন দেখলাম দুপায়ে দুরঙের মোজা পরেছি তখনই বুঝেছিলাম দিনটা খারাপ যাবে।

তারপরও ঈশ্বরদী আসলাম। মনে অস্থির তারুণ্য। ট্রেন স্টেশনে থামার আগেই জোড়াপায়ে লাফ দিতে গিয়ে ধুপ করে পড়ে গেলাম। অঘটন শুরু হলো এখান থেকেই।

প্যান্ট ঝেড়ে-ঝুড়ে চোখ উপরে তুলতেই দেখি একটি বিশাল পাহাড় সামনে দাঁড়িয়ে। বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করছি এমন সময় কোথা থেকে যেন গমগম আওয়াজ ভেসে আসল। ভালোভাবে চোখটা পরিষ্কার করে সামনে তাকিয়ে দেখি সাদা পোশাক পরা এক ভদ্রলোক তার পেল্লাই সাইজের ভুঁড়িটা আমার দিকে তাক করে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে।

আমিও একটু আগ্রহভরা দৃষ্টিতে তাকালাম। আবারও পাহাড় গর্জে উঠল। গমগম করে বল, 'টিকেট আছে?' ততক্ষণে বুঝতে পারলাম, টিকেট চেকার। তাই কথা না বাড়িয়ে বুকপকেট থেকে টিকেটটা বের করে উনার হাতে দিয়ে চুপচাপ হাঁটা ধরলাম।

বিকেলে ভাটাপাড়ার সাথে ক্রিকেট ম্যাচ। গত দু ম্যাচ বড় ব্যবধানে ওদের সাথে হেরেছি। আজ যে করেই হোক জিততেই হবে। কীভাবে খেলা যায় তার প্লানিং করতে যাচ্ছি...

'টিকেট?'

'টিকেট!' সামনে তাকিয়ে দেখি সারস পাখির মতো লম্বা এক ভদ্রলোক মাজা বাঁকা করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

'টিকেট তো ট্রেন থেকে নেমেই টিটিকে দিয়ে দিয়েছি।'

'কোন টিটি? টিকেট তো আমি চেক করি। এই যে টিকেট।' তিনি হাতের তালুতে রাখা কতগুলো টিকেট দেখালেন। তারপর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'এইখানে দাঁড়াও।'

একে একে সবার টিকেট নেবার পর বুড়ো টিটি আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। তাচ্ছিল্যের সুরে জিজ্ঞেস করলেন–

কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

আব্দুল্লাহপুর।

কী করা হয়?

পড়াশোনা।

কোন ক্লাসে?

এসএসসি দিয়েছি।

বুড়ো খেঁকিয়ে উঠল, 'করিস তো পড়াশোনা, মিথ্যা কথা বললি কেন? তুই তো টিকেট কাটিসনি। দে ২০০ টাকা দে।'

এতক্ষণে বুড়োটার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম। কত বড় সাহস, আমাকে ধমক দেয়। এলাকার চায়ের দোকানদার থেকে শুরু করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আমাকে সম্মান করে যেখানে দাদা বলে সেখানে এই ব্যাটা আমাকে তুই তুই করে। মেজাজটা বিগড়ে গেল। উল্টো বললাম, 'আপনি চাইলেন আর আপনাকে আমি ২০০ টাকা দিলাম। মগের মুল্লুক না?...রাস্তা ছাড়েন, আমার সময় নষ্ট হচ্ছে।'

এত ছোট মানুষের মুখে এতবড় কথা শুনে টিটি বাবাজীর মাথা ঘুরে গেল, উল্টাপাল্টা বকতে শুরু করল। তারপর আমার উপর চড়াও হয়ে সোজা স্টেশনমাস্টারের রুমে।

স্টেশনমাস্টার টিটির মুখে সব শুনে বললেন, 'টিকেট যখন কাটনি, ফাইন তো দিতেই হবে।'

আমি শান্ত স্বরে বললাম, 'আমার কাছে টাকা নেই। তা ছাড়া আমি...'

কথা শেষ হবার আগেই বুড়ো ড্রয়ার থেকে হন্তদন্ত হয়ে একটা লাল খাতা বের করে বললেন, 'সত্যিই টাকা নেই তো? আচ্ছা নাম কী বল। তিনদিন জেল খেটে আয়।'

মুখটা গম্ভীর করে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে টিটিকে একবার দেখলাম, তারপর অফিসারকে বললাম, 'স্যার আমি টিকেট কেটেছি, কিন্তু ভুল করে অন্য টিটিকে দিয়ে দিয়েছি। তিনি হয়তো আশেপাশেই আছেন...'

'ঠিক আছে ওনাকে খুঁজে দেখো। পেলে টিকেটটা নিয়ে এসো।'

বুড়ো কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'জীবনেও পারবি না, তুই তো ধান্দাবাজ।' বাইরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই আবার বলল, 'এই ব্যাগ রেখে যা, পালানোর মতলব।'

নীরবে হুম করলাম। পুরো প্লাটফর্ম তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেই টিটিকে না পেয়ে মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেল। মাথাটা বনবন করে ঘুরতে লাগল।

আরে ওই তো সেই টিটি! থপাস থপাস শব্দ করে হেঁটে যাচ্ছে। মুহূর্তে বুক থেকে বিশাল পাথরটা সরে গেল। কাছে গিয়ে সবকিছু সংক্ষেপে বলে টিকেটটা চাইলাম। পকেট হাতড়ে টিকেটটা বের করলেন। গমগম করে কী যেন বললেন। শুনতে পেলাম না।

আমার হাতে টিকেট দেখে বুড়ো টিটির মুখ কাতল মাছের মতো হা হয়ে গেল। দুবার ঢোক গিলল। স্টেশনমাস্টার টিকেট দেখে বললেন, 'ঠিকই তো আছে। ঠিক আছে তুমি যাও।'

এবার আমার পালা। সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হবে না। বুড়োর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম, 'স্বভাবটা ভালো করেন, সবার সাথে তুই-তোকারি করবেন না। নিজে ধান্দাবাজ বলে এটা মনে করবেন না সবাই ধান্দাবাজ।'

উত্তরের অপেক্ষা না করে দ্রুত রুম থেকে বের হয়ে সোজা ওভারব্রিজে চলে এলাম।

এ ঘটনার পর অনেকবার ঈশ্বরদী স্টেশনে গিয়েছি। সেই টিটি সাহেবকেও খুঁজেছি। কিন্তু কোনোদিনও তার দেখা পাইনি।

নবীন, সপ্তম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৯

স্মার্টফোনে আসক্তি কমাবেন কীভাবে

> প্রতিদিন সকালে পত্রিকা পড়ার অভ্যাস ও রাতে বই পড়ার অভ্যাস স্মার্টফোনে আসক্তি অনেক কমিয়ে আনে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী নাফিসা হাসান। চলতে-ফিরতে তাঁর সঙ্গে স্মার্টফোন থাকবেই। মাথা নিচু করে স্মার্টফোনে মুখ গুঁজে রাখা কিংবা কানে ইয়ারফোন দিয়ে কোনো গান শোনাই যেন নাফিসার নিত্যদিনের অভ্যাস। এর সঙ্গে একটু পরপর ফেসবুকের 'টিং' নোটিফিকেশনের শব্দ তো আছে, বন্ধুরা কে কোন ছবিতে লাইক দিয়েছেন তা জানার জন্যই স্মার্টফোন থেকে এক মিটার দূরে যেতেও চান না নাফিসা।

সরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা আজহার কাজ সামলাবেন না মুঠোফোন সামলাবেন তা নিয়ে মাঝেমধ্যেই বিব্রত হন। হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, টুইটার, ক্ল্যাশ অব ক্ল্যানসহ হাজারও নেশায় আসক্ত আজহার আর নাফিসা। এই তরুণদের মতো আমরা অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্রে আমাদের মুঠোফোনে আসক্তির কারণে

হাজারো বিপত্তিতে পড়ি।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস রিভিউ সাময়িকী বলছে, ২০১০ সালের কর্মক্ষেত্রে ৩৯ শতাংশ তরুণ ম্যানেজারের মুঠোফোনে আসক্তি ২০১৪ সালে এসে ৬০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। সপ্তাহে স্মার্টফোনে তরুণ পেশাজীবীরা এখন ৩৫ ঘণ্টার বেশি সময় ব্যয় করেন, যা কি না তাঁদের কাজের গুণগত মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৪৫ ঘণ্টার ওপরে মুঠোফোনে ডুবে থাকেন।

পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক জরিপে জানা যায়, ৪৬ শতাংশ মুঠোফোন ব্যবহারকারী 'ফোন ছাড়া বাঁচবই না' বলে মনে করেন। ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মিজৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, তরুণেরা এখন মুঠোফোনকে তাঁদের শরীরের অঙ্গই মনে করেন। ফ্লোরিডা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা দেখেছেন, মুঠোফোনে আসক্ত ব্যক্তিদের উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। শতকরা ৬৩ শতাংশ মানুষ ঘুম থেকে উঠেই স্মার্টফোনে আগে চোখ রাখেন। মুঠোফোনে আসক্তিকে তো পিসিম্যাগ প্লেগ রোগের সঙ্গে তুলনা করে। টাইম ম্যাগাজিন, ফেমিনা, দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকা মুঠোফোনে আসক্তি কমাতে অনেক বুদ্ধি বের করেছে।

স্মার্টফোনে আসক্তি কমাতে যা করবেন

- ঘুমানোর সময় বালিশের পাশে মুঠোফোন নিয়ে ঘুমাবেন না। এতে ফোনের তেজস্ক্রিয়াজনিত ঝুঁকি থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তেমনি ঘুম থেকে উঠেই স্মার্টফোনে চোখ রাখার অভ্যাস কমানো যায়।
- কোনো মিটিং কিংবা ক্লাসে মুঠোফোন বন্ধ করে ব্যাগে কিংবা টেবিলের ড্রয়ারে রেখে আসুন। মিসড কল অ্যালার্ট সার্ভিসের মাধ্যমে ফোন বন্ধ রাখার সময় কে কে ফোন করেছিলেন তা জানতে পারেন।
- খাওয়ার সময় কখনোই ফোনের পর্দায় চোখ রাখবেন না। খাওয়া উপভোগ করার জন্য ফোন থেকে দূরে থাকুন।
- মুঠোফোনে ই-মেইলের উত্তর দেওয়ার বদলে ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ কম্পিউটারে অভ্যাস করুন।
- ফ্রিডম, অ্যাপডেটক্স, স্টে অন টাস্ক, ব্রেকফিসহ বিভিন্ন অ্যাপ দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্তি কমাতে পারেন। এই অ্যাপগুলো আপনার মুঠোফোনে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপসহ বিভিন্ন অ্যাপ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ রেখে আপনার আসক্তি কমাতে পারে।
- প্রতিদিন সকালে পত্রিকা পড়ার অভ্যাস ও রাতে বই পড়ার অভ্যাস স্মার্টফোনে আসক্তি অনেকটা কমিয়ে আনে।
- ফেসবুক, টুইটারসহ সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে সেটিংস অপশন থেকে নোটিফিকেশন বার্তা কমিয়ে নিতে পারেন।
- স্মার্টফোনে আসক্তি কমাতে সাধারণ মোবাইল ফোন ব্যবহার শুরু করতে পারেন, যা শুধু কাজের জন্য কল দেওয়া আর খুদেবার্তা পাঠানোর জন্য ব্যবহার করবেন।
- বিভিন্ন আড্ডা কিংবা খেলার মাঠে নিজের অংশগ্রহণ বাড়ানোর চেষ্টা করুন। বন্ধুদের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার, বন্ধুদের চোখে চোখ রেখে গল্প-আড্ডায় মেতে উঠুন, এতেও মুঠোফোন আসক্তি অনেক কমে আসে।
- সন্তানকে ফোনে ই-বুক পড়ার অভ্যাসের বদলে রঙিন বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।
- সন্তানের হাতে উচ্চপ্রযুক্তির স্মার্টফোন তুলে না দেওয়াই ভালো। খুব প্রয়োজন হলে সাধারণ ফোন ব্যবহার করার অনুমতি দিতে পারেন।
- দৈনন্দিন কাজের হিসাব, মিটিং কখন, কোথায় তা লেখার জন্য মুঠোফোনের অ্যাপ ব্যবহারের চেয়ে কিছুদিন ডায়েরিতে হাতে-কলমে লেখার অভ্যাস করুন।
- যানজটে বসে মুঠোফোনে মুখ না গুঁজে ব্যাগে বই রাখতে পারেন। যানজটে মুঠোফোনে গান না শুনে বা ফেসবুক ব্যবহার না করে বই পড়ার অভ্যাস করুন।
- কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে সেলফি কিংবা ফোনে ছবি তোলার বদলে অনুষ্ঠানের অতিথিদের সঙ্গে পরিচিতি বাড়ান আর গল্প করার অভ্যাস করুন।

জাহিদ হোসাইন খান
প্রথম আলো ০৬ এপ্রিল ২০১৬
সূত্র: টাইম ম্যাগাজিন, ফেমিনা, দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকা

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে

ব্যাচ ২০১১

ক্রমিক নং	ছাত্র-ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমানে কোথায় পড়ছে
১.	উপেন্দ্র নাথ রায়, ৯৩৪/২০১১ পিতা: সুধারাম কাঞ্চিয়া রায় গ্রাম: খামার বিষ্ণুগঞ্জ (স্কুলপাড়া), ডাকঘর: টংগুয়া, থানা: খানসামা, জেলা: দিনাজপুর।	বিএসএস (অনার্স), ৩য় বর্ষ টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২.	মো. ফিরোজ মেহবুব শাহ, ৯৩৫/২০১১ পিতা: মো. রফিকুল শাহ্ গ্রাম: হাড়িয়ারকুটি (পাতাইপাড়া), ডাকঘর: ডাংগীরহাট, থানা: তারাগঞ্জ, জেলা: রংপুর।	বিএসসি (অনার্স), ৩য় বর্ষ, গণিত হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
৩.	শরিফ মোস্তফা হীরা, ৯৩৬/২০১১ পিতা: সেকান্দার আলী গ্রাম: মালিঝিকান্দা, ডাকঘর: হাতীবান্ধা, থানা: ঝিনাইগাতী, জেলা: শেরপুর।	বিএসএস (অনার্স), ৩য় বর্ষ, নৃবিজ্ঞান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
৪.	মো. ইউনুস আলী, ৯৩৭/২০১১ পিতা: মো. জয়নাল আবেদীন গ্রাম: দক্ষিণ বাড়াই পাড়া, ডাকঘর ও থানা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	এলএলবি (অনার্স), ৩য় বর্ষ, আইন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৫.	হোসাইন মোহাম্মদ জুনাইদ আনসারী, ৯৩৮/২০১১ পিতা: মোহাম্মদ জামাল হোছাইন গ্রাম: দক্ষিণ ফুলছড়ি শিয়া পাড়া, ডাকঘর: খুটাখালী, থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার।	এমবিবিএস, ৩য় বর্ষ শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ঢাকা।
৬.	মো. রশিদুল ইসলাম, ৯৩৯/২০১১ পিতা: মো. রহিম উদ্দিন গ্রাম: ধুবনী, ডাকঘর: শিংগীমারী, থানা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	বিএসএস (অনার্স), ৩য় বর্ষ, অর্থনীতি হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
৭.	এ.বি.এম. রেজায় রাব্বি, ৯৪০/২০১১ পিতা: মো. মোসলেম উদ্দীন বসুনিয়া গ্রাম: নিজাম খাঁ, ডাকঘর: তারাপুর, থানা: সুন্দরগঞ্জ, জেলা: গাইবান্ধা।	বিএস (অনার্স), ৩য় বর্ষ, ভূগোল ও পরিবেশ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৮.	বিধান চন্দ্র বর্মন, ৯৪৩/২০১১ পিতা: হরেন্দ্র নাথ বর্মন গ্রাম: পশ্চিম বেজগ্রাম, ডাকঘর ও থানা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	বিএ (অনার্স), ৪র্থ বর্ষ, সংস্কৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৯.	মো. মেহেদী হাসান সরকার, ৯৪৪/২০১১ পিতা: আবু হারেজ মো. সাদেকুল আলম গ্রাম: পশ্চিম বেজগ্রাম, ডাক ও থানা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	বিএসসি (অনার্স), ৩য় বর্ষ, গণিত সরকারি শাহ সুলতান কলেজ, বগুড়া।
১০.	মো. রাকিবুল ইসলাম, ৯৪৫/২০১১ পিতা: মো. লুৎফর রহমান গ্রাম: পশ্চিম বেজগ্রাম, ডাকঘর ও থানা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	বিএসসি (ইঞ্জি.), ৩য় বর্ষ, যন্ত্রকৌশল রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী।
১১.	মো. রানা হামিদ, ৯৪৬/২০১১ পিতা: মরহুম মোখলেছার রহমান গ্রাম: দৌলত রসুলপুর, ডাকঘর: রানীপুকুর, থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর।	বিএসসি (অনার্স), ৩য় বর্ষ, গণিত কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে

ক্রমিক নং	ছাত্র-ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমানে কোথায় পড়ছে
১২.	আসাদুজ্জামান নয়ন, ৯৪৭/২০১১ পিতা: মনিজুল হক গ্রাম: চিকনমাটি (উদয়ন পাড়া), ডাকঘর ও থানা: ডোমার, জেলা: নীলফামারী।	বিবিএস (পাস), ২য় বর্ষ ডোমার সরকারি কলেজ, নীলফামারী।
১৩.	মো. ফারুক মিয়া, ৯৪৮/২০১১ পিতা: মো. আলী জব্বার হাওলাদার গ্রাম: রাজনগর (থানারকান্দি), ডাকঘর: তালতলা, থানা: নড়িয়া, জেলা: শরিয়তপুর।	বিবিএস (অনার্স), ৩য় বর্ষ, হিসাববিজ্ঞান সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।
১৪.	মো. শাহিদুজ্জামান, ৯৪৯/২০১১ পিতা: মো. আব্দুর রশিদ গ্রাম: পশ্চিম বেজগ্রাম, ডাকঘর ও থানা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	বিএসএস (অনার্স), ৩য় বর্ষ, অর্থনীতি কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।
১৫.	মো. মানিক হোসেন, ৯৫১/২০১১ পিতা: মো. সুলতান আলী গ্রাম: পশ্চিম বেজগ্রাম, ডাকঘর ও থানা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	বিএ (অনার্স), ৩য় বর্ষ, বাংলা কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।
১৬.	মো. রাফসান জানি, ৯৫২/২০১১ পিতা: মো. ইসহাক আলী গ্রাম: পশ্চিম বেজগ্রাম, ডাকঘর ও থানা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	ম্যাটস্, ৪র্থ বর্ষ মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল সিরাজগঞ্জ।
১৭.	মো. শাহীন আলম, ৯৫৩/২০১১ পিতা: মো. আতিয়ার রহমান গ্রাম: পশ্চিম বেজগ্রাম, ডাকঘর ও থানা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	বিএ (পাস), ৩য় বর্ষ, মানবিক আলিমুদ্দিন ডিগ্রি কলেজ, লালমনিরহাট।
১৮.	মো. আনজারুল ইসলাম, ৯৫৪/২০১১ পিতা: মো. আমিনার রহমান গ্রাম: ছোট রাউতা (ময়দান পাড়া), ডাকঘর ও থানা: ডোমার, জেলা: নীলফামারী।	বিবিএ (অনার্স), ৩য় বর্ষ, ব্যবস্থাপনা নীলফামারী, সরকারি কলেজ, নীলফামারী।
১৯.	মো. রবিউল ইসলাম, ৯৫৫/২০১১ পিতা: মো. আব্দুস সাত্তার গ্রাম: দক্ষিণ নয়া পাড়া, ডাকঘর: ঘোড়াঘাট, জেলা: দিনাজপুর।	বিবিএস (অনার্স), ২য় বর্ষ, মার্কেটিং সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।
২০.	আলি হোসেন সুপ্ত, ৯৫৬/২০১১ পিতা: শেখ আব্দুস শহীদ গ্রাম: কালিয়ারই, ডাকঘর: তেঘরী, থানা: কেশবপুর, জেলা: যশোর।	বিএসসি (অনার্স), ৩য় বর্ষ, গণিত সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর।
২১.	মো. মাসুদ রানা, ৯৫৭/২০১১ পিতা: মো. আব্দুর রহমান গ্রাম: আটঘরিয়া, ডাকঘর: মন্নাটলী, থানা: হরিপুর, জেলা: ঠাকুরগাঁও।	বিবিএস (অনার্স), ৩য় বর্ষ, ব্যবস্থাপনা দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর।
২২.	মো. জাহিদ হাসান, ৯৫৮/২০১১ পিতা: মো. রেজাউল করিম গ্রাম: নুরপুর, ডাকঘর: রানীপুকুর, থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর।	বিএসসি (অনার্স), ৩য় বর্ষ, গণিত কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।
২৩.	মো. জাকির হোসেন, ৯৬০/২০১১ পিতা: মো. আবু তাহের গ্রাম: জগন্নাথপুর (দক্ষিণ), ডাকঘর: দৌলতপুর, থানা ও জেলা: ঠাকুরগাঁও।	বিএসসি (অনার্স), ৩য় বর্ষ, রসায়ন হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
২৪.	মো. মমিনুর ইসলাম, ৯৬১/২০১১ পিতা: মো. আবুল হোসেন গ্রাম ও ডাকঘর: বড়খাতা, থানা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	বিএসএস (অনার্স), ৩য় বর্ষ, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মাথায় কত প্রশ্ন আসে

প্রশ্ন : নিশাচর পাখি সম্পর্কে একটু বলা যায় কী?

জবাব : পৃথিবীতে নিশাচর পাখির প্রজাতি আড়াইশর কম–অর্থাৎ মোট পাখি প্রজাতি সংখ্যার তিন শতাংশের মতো। তবে তাদেরও বেশিরভাগ ভোর ও সন্ধ্যার প্রদোষকালে সক্রিয় হয়। অবশ্য ১৩৫ প্রজাতির পেঁচার মধ্যে ৫০টি প্রজাতিই একেবারে পুরোপুরি নিশাচর। তারা মধ্যরাতেও ওড়ে এবং শিকার ধরে। তাদের এই ক্ষমতার মূলে রয়েছে চোখের আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা। পেঁচার দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা মানুষের চেয়ে অন্তত আড়াইগুণ বেশি, আর কবুতরের চেয়ে একশগুণ বেশি।

প্রশ্ন : আই কিউ টেস্ট ব্যাপারটা আসলে কী?

জবাব : ওজন মাপার যন্ত্র দিয়ে তো আর বুদ্ধি মাপা যায় না, তাই বুদ্ধি খাটিয়েই এক পদ্ধতি বের করা হয়েছে তা যাচাই করবার। ইনটিলিজেন্স কোশেন্ট টেস্ট এই পদ্ধতিতে মানসিক বয়সকে আসল বয়স দিয়ে ভাগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে একশো দিয়ে গুন করে তবেই বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়। বলা হয়ে থাকে যে, একশো চল্লিশের উপর যাদের আই কিউ তারা প্রতিভাবান, নব্বই থেকে একশো নয় সাধারণ মেধার এবং সত্তরের নিচে যাদের আই কিউ তারা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন অথবা মানসিকভাবে অসুস্থ। বুদ্ধির এই তুলনামূলক বিচার করতে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন ফরাসি মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড বিনে। বিনে চেয়েছিলেন জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক বিকাশ ঘটাতে। অবশ্য একথা ঠিক যে বুদ্ধির ব্যাপারে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জেনেটিক মেকআপ, উত্তরাধিকার, পরিবেশের প্রভাব–কোনটা যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তা বলা খুবই মুশকিল। মনোবিজ্ঞানী হ্যারল্ড স্টিভেনসনের মতে সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সেইসঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থাই মানুষের সঙ্গে মানুষের আই কিউ এর হেরফের ঘটানোর জন্য দায়ী। কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরন একটি বিশেষ পরিবেশে যে দিতে পারল না, হয়তো ভিন্নতর পরিবেশে সে-ই তার চাইতে অনেক অনেক বেশি উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে পারে। কাজেই আই কিউ এর বিচার পদ্ধতি নিয়ে আজও তর্কের শেষ হয়নি। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত।

যদিও আই কিউ এর বিচার পদ্ধতি ও তার বিশ্লেষণ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে তবু সন্দেহ নেই এর প্রয়োজনীয়তা আধুনিক যুগে অস্বীকার করা যায় না এবং সারা দুনিয়ায় এখন বুদ্ধিমান লোক বাছতে এই পদ্ধতিরও সাহায্য নেয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন : 'পঞ্চম বাহিনী' বলতে কি বোঝানো হয়?

জবাব : কথাটা ইংরেজি 'ফিফথ কলাম' থেকে এসেছে। বাংলায় 'পঞ্চম বাহিনী'। বোঝবার সুবিধের জন্য বলা হয়–অশ্ব, রথ, গজ, পদাতিক–এই চার বাহিনীর বাইরে যে বাহিনী, অর্থাৎ গুপ্তচর বাহিনী। খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯-এ পারস্যের নেতা সাইরাস দ্য গ্রেট ব্যাবিলন শাসক বেলসাজারকে হারানোর জন্য গোপনে বিক্ষুব্ধ ব্যাবিলিনিয় পুরুষদের নিয়ে একটা বাহিনী গড়েছিলেন। এই বাহিনী কীভাবে সাহায্য করেছিল সাইরাসকে, তা জানা যায়নি। তবে ব্যাবিলনের দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে জানা গেছে, বিনা রক্তপাতে শহর দখল করেছিল সাইরাসের সৈন্যবাহিনী। আধুনিক যুগে 'ফিফথ কলাম' নামটার প্রথম ব্যবহার করেন স্প্যানিশ ন্যাশনালিস্ট জেনারেল মোলা ১৯৩৬ সালে। চার 'কলাম' অর্থাৎ সূচিমুখ সৈন্যসজ্জা দিয়ে মদ্রিদ অবরোধের পর বড়াই করে বলেছিলেন, 'ফিফথ কলাম' ইতিপূর্বেই রয়েছে ভেতরে। অর্থাৎ, দেশেরই লোক দেশে বসে যখন বিদেশি শত্রুর সঙ্গে হাত মেলায়, তখনই তাদের বলা হয় 'ফিফথ কলাম' বা 'পঞ্চম বাহিনী'।

প্রশ্ন : মাইক্রোচিপ কী দিয়ে তৈরি হয়?

জবাব : সিলিকন আছে যেসব বস্তুর মধ্যে সেসব দিয়ে। যেমন, বালি, কাদামাটি, চকমকি ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে সিলিকন আছে। পৃথিবীর খোসা অর্থাৎ ভূত্বকের চার ভাগের একভাগেরও বেশি অংশ শুধু এই সিলিকন। খনিজ লোহার মধ্যে থাকে তিন শতাংশ–ইস্পাত

বানাতে দরকার হয়। এইসব জিনিসকে প্রথমে কেমিক্যাল দিয়ে শোধন করে নেওয়া হয়–'মোটামুটি বিশুদ্ধ' সিলিকন পাওয়া যায়–৯৮ শতাংশ বিশুদ্ধ সিলিকন আলাদা করে নেওয়া হয়। নিদারুণভাবে খাঁটি সিলিকন বানানো হয় 'জোন রিফাইনিং' পদ্ধতিতে। সিলিকন রড থেকে বেশিরভাগ অপবস্তু বিদেয় হবার পর CZ পদ্ধতিতে বড় বড় ক্রিস্ট্যাল তৈরি করা হয় সিলিকন রডের মধ্যে। বিদ্যুৎ চালিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া হয় বিশুদ্ধতা। এরপর মেশানো হয় ডোপান্ট।

মাইক্রোচিপের মেমোরি ক্যাপাসিটি কত তা শুনলে অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে হবে। দশ লক্ষ সংকেতের স্মৃতিকোঠা শুধু একটা চিপ। যে চিপের স্মৃতির ক্ষমতা যত বেশি তার দামও তত বেশি। RAM অর্থাৎ Random Access Memory পদ্ধতিতে একটা Concise Oxford Dictionary-র কয়েকটা পাতা মনে রাখতে পারে। অপটিক্যাল ডিস্কের একটা চাকরিতেই থাকবে গোটা এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা।

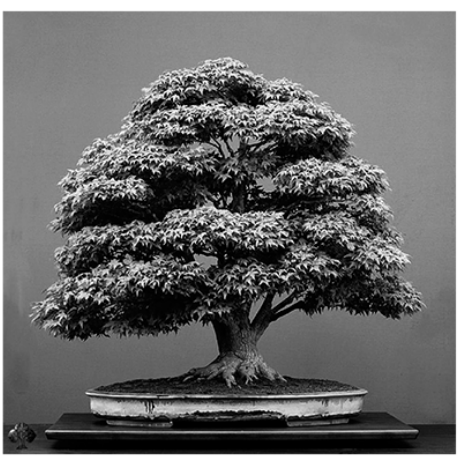

প্রশ্ন : বনসাই কী জিনিস?

জবাব : বনসাই হলো বামন গাছ। বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয় এই বনসাই তৈরি করার জন্য। বনসাই শিল্পে বাহাদুরি দেখিয়েছে জাপান। এই কাজে জাপানিদের তুলনা মেলা ভার। বনসাই শিল্পে জাপানিরা বাহাদুরি দেখালেও ওরা কিন্তু তা শিখেছে চীনাদের কাছ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে। বনসাই-এর অর্থ হলো ট্রেতে পোঁতা গাছ। হর্টিকালচারের বিভিন্ন রকম কলাকৌশল আর প্রয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে ছোট করে রাখা হয় এই গাছগুলোকে, প্রয়োজন মতো গাছের আকৃতি বাড়ানো কমানো হয়। বনসাই লম্বায় এক ইঞ্চিরও ছোট হতে পারে। আর বড় হলে চার ফুট কিংবা তার চেয়ে আর একটু বেশি। তবে বনসাইয়ের উচ্চতা হয় সাধারণত বারো থেকে ছাব্বিশ ইঞ্চির মধ্যে। যেগুলির উচ্চতা এক ইঞ্চিরও কম তাদের বলা হয় শিনতো, যার অর্থ প্রাচীন। ভাবতে অবাক লাগে, এইটুকু উচ্চতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক অতিবৃদ্ধ বৃক্ষ, যার বয়স হবে হয়তো পাঁচশ!

প্রশ্ন : ইলেকট্রিসিটি আর ইলেকট্রনিক্সের মধ্যে তফাৎ কী?

জবাব : দুটোর মধ্যেই রয়েছে ইলেকট্রন প্রবাহ। ইলেকট্রন যখন বয়ে যাচ্ছে তার অথবা কোনো কনডাক্টরের মধ্যে দিয়ে–তখন তা ইলেকট্রিসিটি; ভ্যাকুম অথবা সেমিকনডাক্টরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেলে তা ইলেকট্রনিক্স। এক কথায়, ইলেকট্রন বিদ্যুৎ-পরিবাহী বস্তুর মধ্যে দিয়ে যেতে পারে–তাদের বাইরে দিয়েও যেতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে ইলেকট্রিসিটি–দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্স।

প্রশ্ন : বিমানে কী কী যন্ত্র থাকে?

জবাব : বিমানে এত রকমের যন্ত্রপাতি থাকে যে, পাইলটেরই মাথা গুলিয়ে যেতে পারে। তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো, অলটিমিটার বা উচ্চতা মাপার যন্ত্র, এয়ার স্পিড ইণ্ডিকেটর, ফুয়েল টেম্পারেচার অ্যান্ড ফুয়েল প্রেশার গেজ, আর পি এম ইণ্ডিকেটর (প্রপেলার মিনিটে কতবার ঘুরছে তা এই যন্ত্রটিতে বোঝা যায়), থ্রটল–যার সাহায্যে বিমানের ইঞ্জিনের শক্তি বাড়ানো কমানো হয় (থ্রটল পেছন থেকে একটু একটু করে যত সামনে ঠেলে দেওয়া হবে প্রপেলারও তত জোরে ঘুরতে থাকবে অর্থাৎ আর পিএম বেড়ে যাবে, ইঞ্জিনের শক্তিও বৃদ্ধি পাবে।) টার্ন অ্যান্ড ব্যাংক ইণ্ডিকেটর, ট্রিমার, কম্পাস। মেইন কন্ট্রোল হুইল (এর সাহায্যে এলিভেটর ও এলিরনকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়) এবং রেডার। এই রেডারের সাহায্যে বিমানটিকে ডান বা বাঁ দিকে ঘোরানো হয়। অনেকেই রেডার (Radar) যন্ত্রটির সঙ্গে রাডারের (Rudder) গোলমাল করে ফেলেন। আধুনিক সব বিমানেই ছোট্ট একটি 'ওয়েদার রেডার' বসানো থাকে। বিমানের সামনে এবং দুপাশে অনেকখানি অঞ্চলের আবহাওয়ার অবস্থা এই রেডারে ধরা পড়ে।

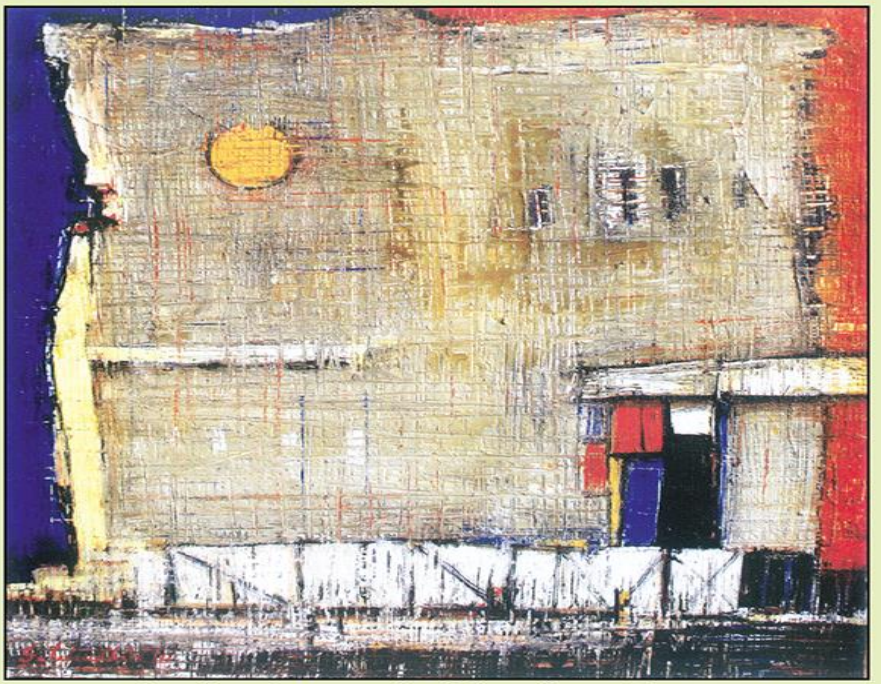

ছবি : স্মৃতির কুটির | মাধ্যম : মিশ্র | শিল্পী : কাজী সালাহউদ্দিন আহমেদ

ছবি : পাখির বিচরণ ভূমি | মাধ্যম : অ্যাক্রেলিক | শিল্পী : রেজাউন নবী

নবীন

পঞ্চদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা এপ্রিল-জুন ২০১৭

সম্পাদক তাসনিম হাসান হাই কর্তৃক হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ৯-সি, রূপায়ন শেলফোর্ড
প্লট নং-২৩/৬, ব্লক-বি, বীর উত্তম এ এন এম নুরুজ্জামান সড়ক, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭ এর পক্ষে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ : যাযাবর মিন্টু। মুদ্রণ : পালক ০১৭১১৮৩৪০১৭। গ্রাফিক ডিজাইন : মমিন হোসেন